পথে প্রবাসে দিন কাটে। রাত কাটে।

এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সফর করেন যুবক মইনুদ্দিন। নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। শুধু পথ চলা। দিনের পর দিন শুধু চলা আর চলা।

জাহেরী এলেম শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। বোখারা সমরখন্দের বিখ্যাত আলেমগণের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা করেছেন দ্বীন সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়। তফসীর, ফেকাহ্, হাদীস– আরো কতো কি।

বিদ্যাশিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীগণ ঘরে ফিরে যায়। শিক্ষা সমাপনের পরিতৃপ্তি নিয়ে মিলিত হয় আপনজনদের সাথে।

কিন্তু মইনুদ্দিন যাবেন কোথায়? মা নেই। বাপ নেই। ঘর নেই। বাড়ী নেই। কোথায় কার কাছে যাবেন তিনি।

তার চেয়ে পথই ভালো। উপরে উন্মুক্ত আকাশ। দিনে সূর্য। রাতে চাঁদ-তারা। নিচে নিসর্গের অপরূপ বিস্তার। কোথাও সমভূমি। কোথাও সারিবদ্ধ পাহাড়ের মিছিল। কোথাও উপল-শোভিত অমসৃণ পথ। কোথাও মরু-মরুদ্যান। ঘন কালো বনভূমি।

এবার বইয়ের পাতায় নয়। এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে নিসর্গের পাতায়। কী বিশাল, কী রহস্যময় এই নিসর্গ গ্রন্থ। বৃক্ষ, ফুল, ফল, প্রবহমান ঝর্ণার রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্বচ্ছ সলিল। পাখিদের নীড় বাঁধা, নীড় ছাড়া। ঋতু বদলের নিঃশব্দ সঙ্গীত। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের নিয়মিত নভঃ পরিক্রমা। কে এঁকেছে এমন নিখুঁত পূর্ণ প্রতিকৃতি? তাঁর দেখা চাই। তাঁর পরিচয় চাই। তাঁর জন্যেই অন্বেষণ এবার।

তাঁর অন্বেষণের অনল অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলছে। সেই কবে থেকে জ্বলছে। অন্তরের অন্তমূলে জ্বলছে।

সেই শুভদিন। সেই অবিস্মরণীয় দিন। সেই দিনেই ইশকের অব্যক্ত অনল অন্তরের শামাদানে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রেমিক বুজর্গ– সেই মজজুব অলি আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিম কান্দুযী র.।

কতোই বা বয়স হবে তখন। কৈশোরের প্রান্তদেশ। পনের বছর মাত্র।

কিছুকাল আগে মাতা পিতা দু'জনই ইন্তেকাল করেছেন মইনুদ্দিনের। প্রথমে পিতা। তার পর মাতা।

এখন দুনিয়ার নিকটজন বলতে আর কেউ নেই তাঁর। মা বাপ ভাইবোন কেউ না। তাঁর সংসারের একাই সদস্য তিনি। পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন একটা ফলের বাগান আর গম পিষবার জন্য একখানা যাঁতা।

সেই ফলের বাগানেই একদিন বসে বিশ্রাম করছিলেন মইনুদ্দিন। বাগানের কাজ রীতিমতো পরিশ্রমের। পানিসিঞ্চন। মাটি নিড়ানো। আগাছা উপড়ানো। আরো কতো ছোটো খাট কাজ।

বাগানের পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্তি দূর করবার জন্য এভাবেই তাই বিশ্রাম করে নিতে হয়। তখন মনে ভিড় করে কতো রকমের ভাবনা। অন্তরে মাতৃ-পিতৃ বিয়োগের তাজা শোক। পৃথিবীর মানুষের কোলাহলে কিশোর মইনুদ্দিন একা। জানা নেই জীবনের গতি এবার কোন পথে মোড় নেবে। কিশোর-কলিজায় চলে শোক দুঃখের লীলা খেলা।

সেদিনও বিশ্রাম করছিলেন মইনুদ্দিন। হঠাৎ তিনি দেখলেন বাগানে প্রবেশ করলেন একজন উদভ্রান্ত আগন্তুক। দেখলেই বোঝা যায়, তিনি আল্লাহ্ প্রেমে পাগল এক মজজুব ফকির। দুনিয়ার দিকে তাঁর নজর নেই একেবারেই।

সহসা মজজুব ফকিরের নজর পড়লো কিশোর মইনুদ্দিনের প্রতি। আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ইশারা। হয়তো এই কিশোরের জন্যই আল্লাহ্‌পাক এখানে পাঠিয়েছেন মজজুব ফকিরকে। তিনি বুঝলেন– এই কিশোর তো সাধারণ কিশোর নন। আগামী পৃথিবী তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে এই পবিত্র কিশোরের জন্য। এই কিশোরইতো তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে আন্দোলিত করবেন লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের অঙ্গন।

মইনুদ্দিন এগিয়ে গেলেন। আগন্তুক মেহমানকে সমাদর করে গাছের ছায়ায় নিয়ে এলেন। বসতে বললেন তাঁকে। তারপর আঙ্গুর গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলেন এক গুচ্ছ আঙ্গুর। খেতে বললেন মজজুব ফকিরকে।

খুশী হলেন দরবেশ। মইনুদ্দিনের মন রক্ষার জন্য কয়েকটি আঙ্গুর মুখে দিলেন তিনি। তারপর দুই হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ ধরে মইনুদ্দিনের জন্য দোয়া করলেন। দোয়া শেষে তাঁর ঝুলি থেকে বের করলেন এক টুকরো শুকনো রুটি। রুটির একাংশ কিছুক্ষণ ধরে চিবোলেন তিনি। তারপর অবশিষ্টাংশ মইনুদ্দিনের হাতে দিয়ে বললেন, 'খাও'।

আদেশ পালন করলেন মইনুদ্দিন।

একটু পরেই উচ্ছিষ্ট রুটির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হতে শুরু করলো। বিস্মিত হলেন মইনুদ্দিন। এ কেমন আশ্চর্য খাদ্য দিয়েছেন এই আত্মভোলা আল্লাহ্ প্রেমিক। অন্তরের আচ্ছাদন যেনো উবে যাচ্ছে একে একে। অদ্ভুত এক জ্যোতির্ময় অনুভব এসে ধীরে ধীরে আলোকিত করছে হৃদয়ের অলি গলি, রাজপথ, সবকিছু।

দরবেশ চলে গেলেন। অন্তরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন আল্লাহ্ প্রেমের অনন্ত অনল।

সেই দুনিয়া বিমুখ দরবেশও সাধারণ কেউ নন। তিনিই সেই সম্মানিত বিশ্বখ্যাত আউলিয়া– যাঁর তাওয়াজ্জোহ্ই রচনা করেছিলো মইনুদ্দিনের মনোভূমিতে পরবর্তী সাধনা-সংকুল জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। খাজা মইনুদ্দিন চিশ্তী র. এর জীবন কাহিনীর সঙ্গে এই প্রেমিক আউলিয়ার নামও তাই শত শত বছর ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে এখনো। এই মহাসম্মানিত বুজর্গের নাম ইব্রাহিম কান্দুযি। হজরত খাজা ইব্রাহিম কান্দুযি র.।

আর কেনো তবে পিছনের টান। গৃহের আকর্ষণ। কিসের বাগান। কিসের বাড়ী। কোনো কিছুই ভালো লাগে না আর। অজানার পথে পাড়ি দিতে চায় মন।

বাগান, যাঁতা– সব কিছু বিক্রি করে দিলেন মইনুদ্দিন। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ বিতরণ করে দিলেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে। তারপর বেরিয়ে পড়লেন পথে।

আল্লাহ্ প্রেমের পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়। শুধু উন্মাদনায় মজে থাকলে তো গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আল্লাহ্ প্রাপ্তির প্রথম শর্ত– শরীয়তের জ্ঞান অর্জন। তারপর মারেফতের পথ পাড়ি দিতে হবে সাহসী নাবিকের মতো।

জাহেরী এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যেই পথ চিনে চিনে মইনুদ্দিন প্রথমে হাজির হলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম দ্বীনি এলেম শিক্ষার পাদপীঠ বোখারা, সমরখন্দে। তারপর দীর্ঘ দিন সেখানে অবস্থান করে একে একে বুৎপত্তি অর্জন করলেন জাহেরী এলেমের সমস্ত শাখা প্রশাখায়।

তারপর পথ। তারপর প্রবাস। পথে পথে পরিভ্রমণ। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ক্রমাগত চলা আর চলা। নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। গৃহ নেই। আপন স্বজন নেই।

অন্বেষণের অজানা আকর্ষণে কখনো জনপদে কখনো বিজন বনভূমিতে খানিক বিশ্রামের আয়োজন। তার আগে পরে শুধু পথ-পরিক্রমণ।

পিছনের স্মৃতি-শামাদান কখনো জ্বলে– কখনো নিভে যায়। জন্মভূমির আকর্ষণ বিস্মৃত কি হয় কেউ কোনোকালে?

কতো কথা মনে হয়। আবার মনে হয়ও না সব কথা। আকাশের নক্ষত্র যেমন। কোনোটা সুস্পষ্ট। তীব্র দ্যুতিময়। কোনোটা অস্পষ্ট। জ্বলে। নেভে। আবার জ্বলে। স্মৃতি বিস্মৃতিও তেমনি সাজানো থাকে অন্তরের অদৃশ্য অয়নে।

সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সিস্তান রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে জনপদে শুরু হয়েছে লুটতরাজ। রাহাজানি। মারামারি। কাটাকাটি।

সলজুক খান্দানের বাদশাহ্ তখন সিস্তানের অধিনায়ক পদে সমারূঢ়। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলো না শেষ পর্যন্ত। এ বিশৃঙ্খলার বীজতো সুলতান নিজেই বপন করেছেন তার শাসনের শুরু থেকে। তার স্বৈরাচারী শাসনের ফলে আজ রাজ্যের কোণায় কোণায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন ফেৎনা ফাসাদ। গৃহবিবাদে ছেয়ে গেছে সমস্ত দেশ। পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সমস্ত রাজ্য।

গৃহবিবাদের সুযোগে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আর এক দুর্ধর্ষ ডাকাতদল। তাতার সম্প্রদায়। হিংস্রতায় বন্য পশুও তাদের কাছে হার মানে। তাদের ব্যাপক লুণ্ঠতরাজ ও হত্যাযজ্ঞে সন্ত্রস্ত জনজীবন।

সুলতান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে তাতারদের মোকাবেলায় নামলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন শেষ পর্যন্ত। বন্দী হলেন তিনি তাতার বাহিনীর হাতে।

এরপর অত্যাচার বেড়ে গেলো প্রচণ্ডভাবে। তাতার বাহিনী যেখানে যাকে পেলো তাকেই হত্যা করতে লাগলো। নির্বিবাদে তারা লুণ্ঠ করতে লাগলো সবকিছু।

সেই চরম বিশৃঙ্খল সময়ে দুনিয়ায় এলেন শান্তির দূত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র.। এই নিস্পাপ শিশু যেনো এলো অশান্তির অবসান ঘটাতে। এ যেনো আঁধার রাত্রি ফুঁড়ে দিবসের আলোর অপ্রতিরোধ্য আগমনাভাস।

তখন হিজরী পাঁচ শত তিরিশ। সিস্তান রাজ্যের সঞ্জর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করলেন শিশু আউলিয়া মইনুদ্দিন। তাঁর পিতা আদর করে তাঁর নাম রাখলেন হাসান। হাসান মানে সুন্দর। সত্যিই সুন্দর তিনি। অনন্য সৌন্দর্যের বেহেশতি সুবাস বয়ে নিয়ে এলেন তিনি ধূলার পৃথিবীতে।

পিতা গিয়াসুদ্দিন, মাতা সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা, দু'জনেই দেখলেন, নতুন মেহমানের বেহেশতী বদন। তাঁরা যতো দেখেন ততোই মুগ্ধ হন। আবার চিন্তিত হয়ে পড়েন পরক্ষণে। এই শিশু নিশ্চয় জগদ্বিখ্যাত আউলিয়া হবেন। গর্ভাবস্থায় প্রকাশিত নানা প্রকার শুভ আলামতে এই বিশ্বাসই নিশ্চিত হয়েছে মনে।

তাই, নিজেদের জন্য নয়। এই নবজাতক শিশুর হেফাজতের চিন্তাতেই পেরেশান হয়ে পড়েন মইনুদ্দিনের মাতা পিতা।

সঞ্জরে জীবনের নিরাপত্তা নেই। সম্পদের নিরাপত্তা নেই। ভীত সন্ত্রস্ত নিরাপত্তাহীন সঞ্জর, খাজা মইনুদ্দিন হাসান চিশতীর মনোমুগ্ধকর জন্মভূমি তাই পরিত্যাগ করতে হলো শেষ পর্যন্ত।

হজরত গিয়াসুদ্দিন র. সপরিবারে হিজরত করলেন। আশ্রয় নিলেন এসে খোরাসানে। এভাবে জন্মের পরেই জন্মভূমি ছাড়তে হলো মইনুদ্দিনকে।

কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস। তাতারীদের অত্যাচারও বিস্তৃত হয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। খোরাসানও বিক্ষিপ্তভাবে জর্জরিত হতে লাগলো তাতারীদের অত্যাচারে।

এভাবেই গড়িয়ে চললো দিন। মাস। বছর। বছরের পর বছর। এরকম বিশৃঙ্খলার মধ্যেই বেড়ে উঠলেন মইনুদ্দিন। এভাবেই কেটে গেলো তার সমস্ত বাল্যবেলা।

মইনুদ্দিন তখন তেরো বছরের বালক। কিন্তু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে তখনো বিদ্যাশিক্ষা শুরুই করতে পারলেন না তিনি। তাঁর শিশু মন মানুষের দুঃখে কাঁদে। হায় মানুষ কি অশান্ত। উচ্ছৃঙ্খল। মায়া মমতা ভালোবাসা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে?

দুস্থ মানুষের জন্য তাঁর বালক-মন কাঁদে। কখনো তিনি সমবয়সী অভুক্ত খেলার সাথীকে আদর করে বাড়ীতে ডেকে আনেন। নিজের জন্য তৈরী করা খাবার পুরোটাই তুলে দেন ক্ষুধার্ত সঙ্গীর মুখে। অলি আল্লাহ্ মাতা বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন তাঁর সন্তানের কার্যকলাপ। আনন্দে ভরে ওঠে তাঁর বুক। আল্লাহ্পাকের বেশুমার শোকর। আল্লাহ্পাক তাঁর সন্তানের অন্তরে মানুষের জন্য দিয়েছেন সীমাহীন দরদ। দেখেন আর বিস্ময়াভিভূত হন মা। প্রাণ খুলে দোয়া করেন, ইয়া আল্লাহ্ এমনি করেই যেনো আমার সন্তান তোমার সৃষ্টিকে ভালোবেসে যেতে পারে।

সাত বছর বয়স থেকেই আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন মইনুদ্দিন। নিয়মিত নামাজ পড়েন। নিয়মিত রোজা রাখেন।

একদিন হজরত গিয়াসুদ্দিন সন্তানকে নিয়ে ঈদের নামাজে যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা এক অসহায় বালক। মইনুদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন তৎক্ষণাৎ। নিজের নতুন জামা খুলে সঙ্গে সঙ্গে পরিয়ে দিলেন তিনি সেই দুস্থ বালককে।

আনন্দে আকুল হলেন পিতা। আহা কি প্রেমভরা অন্তরের সন্তান পেয়েছেন তিনি। শোকর। লক্ষকোটি শোকর আল্লাহ্র দরবারে। এতো দয়া যার অন্তরে, তিনি কি তবে বিশ্ব মাতাল করা আউলিয়া না হয়ে পারেন?

পিতা মাতা উভয় দিক দিয়েই তিনি সৈয়দ। রসূলেপাক স. এর যোগ্যতম অধস্তন পুরুষ। শিরায় শিরায় তাঁর খেলে যায় রসূল স. এর রক্ত ধারা। স্বভাবে সেরকমই বিশ্বপ্লাবী প্রেম।

ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন হজরত গিয়াসুদ্দিন র.। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে নানাস্থানে সফর করতে হয়। বিভিন্ন দূরবর্তী শহরে নগরে মাঝে মাঝেই সফর করেন তিনি। সফর শেষে আবার গৃহে ফিরে আসেন। সময় হলে আবার বেরিয়ে পড়েন হালাল রিজিকের অনুসন্ধানে।

সেবার তিনি গেলেন শামদেশে। ফিরে আসবার নির্দিষ্ট তারিখ পার হয়ে গেলো। তারপরও গেলো আরো কতোদিন। তবু তাঁর ফেরার নাম নেই।

এদিকে উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করেন উম্মুল ওয়ারা। মইনুদ্দিন। প্রতীক্ষায় কাল কাটে। তবুও ফিরে আসেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই তিনি আর ফিরে এলেন না। এলো শোকাবহ সংবাদ। গিয়াসুদ্দিন র. আর দুনিয়ায় নেই। আল্লাহ্পাক তাঁকে ডেকে নিয়েছেন নিজের কাছে।

ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন গিয়াসউদ্দিন। তাঁর ব্যবসা ছিলো বিভিন্ন শহরে বিস্তৃত। বালক মইনুদ্দিনের বয়স তখন পনেরো। তিনি জানেন না কোথায় কি আছে। কতোটুকু আছে। কোন শহরে কার সঙ্গে লেন দেন করেন তাঁর ব্যবসায়ী বুজর্গ পিতা।

তাই পিতৃবিয়োগের পর ব্যবসার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেলো একেবারে। শুধু বাড়ীর ভিটে টুকু আর তার কাছাকাছি একটা ফলের বাগান। আর কোনো সম্পদ পেলেন না মইনুদ্দিন। উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাগান আর আটা পিষবার একটি যাঁতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না তিনি।

সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে হলো মইনুদ্দিনকে। কায়ক্লেশে তিনি বাগানে ফলের আবাদ করেন। পরিশ্রম করেন সারাদিন। মাতা পুত্র দু'জন মাত্র মানুষইতো সংসারে। অসুবিধা হলো না তেমন।

কিন্তু তবুও তিনি পিতৃবিয়োগের পর আর কখনো হাসি দেখলেন না তাঁর পুণ্যময়ী মাতার বিষণ্ন মুখে। শোকে যেনো নির্বাক হয়ে গেছেন তিনি। পতিপ্রাণা উম্মুল ওয়ারা স্বামী বিয়োগের শোক ভুলতে পারলেন না আর। মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে তিনিও পাড়ি দিলেন পরপারে। থাক। মইনুদ্দিন একাই থাক এখানে। তাঁর তো অনেক কাজ। আল্লাহ্পাক তো তাঁকে দ্বীনের কাজের জন্যই মনোনীত করেছেন। মাতা পিতা না থাকলে কী। আল্লাহ্ তো আছেন। আল্লাহ্পাকই সকল মখলুকাতের একমাত্র অভিভাবক।

একা। একেবারে একা হয়ে গেলেন মইনুদ্দিন। কী এক ঘোর লাগা সম্মোহনের মধ্য দিয়ে সময় বয়ে যায়।

বাগানে কাজ করেন। বাগানেই বসে থাকেন সারাদিন। এভাবেই একদিন অকস্মাৎ দেখা হলো সেই মজজুব আউলিয়া হজরত ইব্রাহিম কান্দুযীর সঙ্গে। তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পিছনের সকল টান ছিঁড়ে ফেলে তিনি নামলেন পথে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রথমে গেলেন বোখারা সমরখন্দে। সেখানে ৫৪৪ হিজরী থেকে ৫৫০ হিজরী পর্যন্ত জাহেরী বিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করে আবার সফর শুরু করলেন তিনি অজানার উদ্দেশ্যে।

পথ। হ্যাঁ পথই ভালো। নিসর্গের বুক চিরে ক্রমাগত পথ চলেন মইনুদ্দিন। পথে প্রবাসে দিন কাটে। রাত কাটে।

বোখারা থেকে প্রথমে নিশাপুর এসে উপস্থিত হলেন মইনুদ্দিন। তারপর সেখান থেকে গেলেন খোরাসানে। তারপর রওনা দিলেন ইরাক অভিমুখে।

এলেন বাগদাদে। কী বিচিত্র আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি জগত। আসমান জমিন গ্রহ নক্ষত্র পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র। সবচেয়ে বেশী বিচিত্র মানুষ। আর যাঁরা আল্লাহপ্রেমিক তাঁরা তো আরো বেশী রহস্যময়।

পথে প্রবাসে দিন কাটান হজরত মইনুদ্দিন। আর অনুসন্ধান করেন, কোথায় সাক্ষাত পাওয়া যায় আল্লাহ্পাকের প্রিয়বান্দাদের। তাঁদের সোহবতে সময় কাটান। জ্ঞান অর্জন করেন। সত্যিই আল্লাহ্পাকের অলিগণই প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী। তাঁদের পবিত্র সোহবত ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কেতাবী জ্ঞান তো সারহীন ফলের মতো। গন্ধহীন ফুলের মতো। স্বাদহীন খাদ্যের মতো।

তখন হিজরী ৫৫০ সাল। বাগদাদে এসে সাক্ষাত পেলেন হজরত বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী র. এর। রতনে রতন চেনে। হজরত বড়পীর র. যথার্থই চিনতে পারলেন হজরত মইনুদ্দিনকে। তাঁর সম্পর্কে এরশাদ করলেন, এই ব্যক্তি তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ আউলিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন তাঁর মাধ্যমে।

হজরত বড়পীর র. এর দরবারেই কেটে গেলো অনেকদিন। দিন গেলো। মাস গেলো। অবশেষে একদিন এলো বিদায়ের পালা। বিদায় বেলায় হজরত বড়পীর র. বললেন, 'হে মইনুদ্দিন। তুমি যখন হিন্দুস্থানে সফর করবে, তখন পথে পড়বে ভাতীসা রমন্ত নামে এক স্থান। সে স্থানে আছে সিংহতুল্য এক মর্দে মুমিন। তাঁর কথা মনে রেখো তুমি।'

হজরত মইনুদ্দিন নীরব সম্মতি জানালেন। তারপর আবার নামলেন পথে। আবার শুরু হলো পথ চলা।

বিচিত্র এই পথ পরিভ্রমণ। এ যেনো এক নেশা, সম্মোহন। নিসর্গের নীরব আদর শরীর ও মনে মেখে নিয়ে প্রতিদিন চলে এই বিরতিহীন পথযাত্রা।

মনস্থির করলেন মইনুদ্দিন। সিরিয়া যেতে হবে এবার। এ সফরের বর্ণনা নিজমুখেই করেছেন তিনি। বলেছেন– 'কয়েকদিন ক্লেশকর সফরের পর সিরিয়ার নিকটবর্তী এক নগরে এসে পৌঁছলাম আমি। শুনলাম, সেখানে আহাদ মোহাম্মদ আল ওয়াহিদ নামে একজন কামেল আউলিয়া আছেন। পাহাড়ের পাদদেশে এক গুহায় বসবাস করেন তিনি। আমার ইচ্ছে হলো তাঁর সাথে সাক্ষাত করে উপকৃত হই। দেখতে গেলামও তাঁকে। কিন্তু গুহার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকে। দেখলাম, তাঁর গুহার দুপাশে পাহারারত দু'টি বিরাট বাঘ। বাঘ দেখে তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের ইচ্ছা বাধ্য হয়েই পরিত্যাগ করতে হলো। ফিরে আসছিলাম আমি। এমন সময় ডাক শুনতে পেলাম সেই মহান বুজর্গের, 'মইনুদ্দিন। চলে এসো এখানে। কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে চলে এসো আমার কাছে।'

কাছে গেলাম তাঁর। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তুমি যদি কারো ক্ষতি করতে না চাও, তোমার ক্ষতিও করবে না কেউ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, সবাই তাকে ভয় করে চলে।'

হজরত আল ওয়াহিদ র. জানতে চাইলেন, 'কোথা থেকে এসেছো তুমি?'

আমি বললাম, 'বাগদাদ থেকে।'

এবার নসিহত করতে শুরু করলেন হজরত আল ওয়াহিদ। বললেন, 'আমি তিরিশ বছর ধরে এই নির্জন নিবাসে বসে কাঁদছি শুধু। কি কারণে কাঁদছি- জানো তুমি?'

আমি বললাম, 'না। কেনো? কি কারণে কাঁদছেন আপনি?'

জবাব দিলেন হজরত আল ওয়াহিদ, 'নামাজ। জানো আমি যখন নামাজ আদায় করি, তখন ভাবি, আমার নামাজের কতোটুকু মূল্য? বন্দেগীর হক কি আমার নামাজে আদায় হয়? মনে হয় কোথাও ভুল হয়ে গেলো। মনে হয় আমার সকল চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেলো বুঝি।'

এরপর আবার অমূল্য উপদেশ দান করলেন হজরত আল ওয়াহিদ, 'হে আল্লাহ্‌র পথের পথিক। নামাজের মতো নামাজ যদি আদায় করতে সক্ষম হও– তাহলে তো তুমি সম্পন্ন করলে এক মহান দায়িত্ব। অন্যথায় বরবাদ করে দিলে তোমার অমূল্য জীবন।'

আবার পথে নামলেন হজরত মইনুদ্দিন। হিজরী ৫৫১ সাল চলছে তখন। মইনুদ্দিন মনস্থির করলেন– হজ্ব সমাপন করতে হবে এবার। বায়তুল্লাহ্ জেয়ারতের উদগ্র বাসনা অন্তর উতলা করে দিতে চায়। সেই আয়তাকার প্রেমের গৃহ। সেই তৌহিদের সিপাহসালার হজরত ইব্রাহিম আ. আর তাঁর প্রিয় পুত্র আত্মউৎসর্গের অবিস্মরণীয় আদর্শ হজরত ইসমাইল আ.। পিতা পুত্র। দু'জনে মিলে প্রেম দিয়ে, শুধু বিশুদ্ধ আল্লাহ্ প্রেম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন যে কাবা– কি দুর্নিবার তার আকর্ষণ। আশেক ব্যক্তিগণের প্রেমের কেবলা সেই কাবায়ে মোয়াজ্জমার জেয়ারতের জন্য উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন মইনুদ্দিন।

আল্লাহ্‌পাক বাসনা মঞ্জুর করলেন। হজ্ব সমাপন করলেন মইনুদ্দিন। তারপর সরওয়ারে দোজাঁহা হজরত রসুলে করিম স. এর মোবারক রওজা শরীফ জেয়ারত করে আবার তিনি নামলেন পথে।

আবার পথ। আবার প্রবাস। আবার পথ চলা। আবার ফিরে চললেন তিনি বাগদাদের পথে।

মন কী? কেমন? এতো পিপাসা কেনো মনে? এতো তৃষ্ণার সলিল কোথায় কার বুকে তাঁর জন্য জমা রেখেছেন আল্লাহ্‌পাক। কোথায় তিনি? যে মহান নায়েবে রসূল স. কে তাঁর মোর্শেদ মনোনীত করে রেখেছেন আল্লাহ্‌পাক। জানা নেই কোথায় তাঁর আবাস।

নগর থেকে নগরে জনপদ থেকে জনপদে দেশ থেকে দেশে তাঁরই অন্বেষণে পথ চলে মইনুদ্দিন। মোর্শেদের হৃদয়ে হৃদয় না রাখলে আল্লাহ্ প্রাপ্তি কেমন করে সম্ভব? মোর্শেদের অন্তরই তো আল্লাহ্ প্রাপ্তির দরওয়াজা।

পথ চলতে চলতে হারুন নগরে উপস্থিত হলেন হজরত মইনুদ্দিন। এখানে এসেই মন তাঁর কেমন হয়ে গেলো যেনো। মনে হলো এখানেই স্থির হবে মন।

এলো সেই শুভক্ষণ। লোকমুখে শুনলেন, এখানে হজরত ওসমান হারুনী র. এর বসবাস।

ওসমান হারুনী। হজরত ওসমান হারুনী চিশতী র. । খোরাসান ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা নিশাপুর। এই নিশাপুরের অন্তর্গত ছোট শহর হারুন। হারুনেই জন্মগ্রহণ করেন আউলিয়া সম্প্রদায়ের মস্তকের মুকুট হজরত ওসমান হারুনী। তাঁর ঐতিহ্যবাহী বংশধারা একাদশ পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়েছে রসূলে করিম স. এর প্রিয় জামাতা হজরত আলী রা. এর সঙ্গে।

বাল্যকালেই কোরআনুল করিম হেফজ করেন তিনি। এর পর নিশাপুরের ইসলামী আরাবী দারুল উলুমে ভর্তি হন শিক্ষা গ্রহণের জন্য। অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন ওসমান হারুনী। পূর্ণ সফলতার সাথে বিদ্যাশিক্ষা শেষে তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমের পদমর্যাদায় ভূষিত হন।

তারপর অন্তরের উদগ্র তাড়নায় এখতেয়ার করেন এলমে মারেফতের পথ। হাজির হন গিয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া খাজা হাজী শরীফ জিন্দানী র. এর দরবারে। তাঁর নিকট মুরিদ হয়ে তাঁর খেদমতে ও সোহবতে কাটিয়ে দেন দীর্ঘ কয়েকটি বছর।

তারপর এলেমের এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌পাক তাঁকে দান করলেন পূর্ণ সফলতা। নিজ পীর ও মোর্শেদের নিকট থেকে তিনি লাভ করলেন খেরকা ও খেলাফত।

হজরত ওসমান হারূনীর সাধনার ধারা ছিলো বিস্ময়কর। বর্ণিত আছে, সত্তর বছর যাবত তিনি কখনো বিছানায় শয়ন করেননি। দিনে রাতে দুই বার কোরআন মজিদ খতম করতেন তিনি। কখনো তিন দিন পর। কখনো পাঁচ সাত দিন পর পর মাত্র তিন চার লোকমা আহারের অভ্যাস ছিলো তাঁর। মাঝে মাঝে এক বার কি দুইবার মাত্র এক চুমুক করে পানি পান করতেন।

হজরতের রূহানী ক্ষমতা ছিলো প্রচণ্ড তেজদীপ্ত। নিখুঁত কাশফ ও কারামতের অধিকারীও ছিলেন তিনি। তাঁর দ্বারা প্রকাশিত কারামতের সংখ্যা বেশুমার।

জ্ঞানান্বেষণের তৃষ্ণা ছিলো তাঁর অন্তহীন। জ্ঞানআহরণ ও মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যয় করেছিলেন বহু স্থান সফর করে। মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, ইয়েমেন, হেজাজ, বাগদাদ, কারবালা, নজফ, ইরাক, দামেশক, বায়তুল মোকাদ্দাস, সিরিয়া, সমরখন্দ, বলখ, বোখারা ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন তিনি। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁর রূহানী নেসবতের নূরে প্রজ্বলিত করেছেন হাজার হাজার কলুষিত কলব। দিয়েছেন সবাইকে আল্লাহ্ প্রেমের নির্ভুল ঠিকানা।

এভাবে সফর করতে করতেই সমাপ্ত হয় এই অবিস্মরণীয় আউলিয়া জীবনের শেষ অধ্যায়। তখন মক্কা মোয়াজ্জমায় এতেকাফ অবস্থায় ছিলেন তিনি। সে সময়ই পরম প্রভু তাঁকে দুনিয়ার জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে দান করেন পবিত্র অনন্ত জীবন। এক শাওয়াল মাসের ছয় তারিখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন তিনি।

কাবা শরীফ এবং জান্নাতুল মোয়াল্লার মাঝামাঝি স্থানে কবর দেওয়া হয় তাঁর। সে কবরের আর চিহ্ন নেই এখন। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচিহ্ন এখনো অম্লান হয়ে আছে অসংখ্য আল্লাহ্ প্রেমিকগণের অন্তর্জগতে।

হজরত মইনুদ্দিন সেই মহান বুজর্গের দরবারেই হাজির হলেন।

ওসমান হারূনী চিশ্তী। হারূন নগরে জন্ম বলে তিনি হারূনী। আর সেই সাথে তিনি চিশ্ত নগরের স্মৃতিও ধারণ করে আছেন বুকে। তাই নামেও হয়েছেন চিশ্তী। সেই চিশত্ শহরের নামে তাঁর তরিকার নামও হয়েছে চিশ্তীয়া তরিকা। চিশ্তী চেরাগও এমনিভাবে বুক থেকে বুকে প্রজ্বলিত হয়ে আসছে যুগে যুগে।

সে এক পবিত্র প্রেমস্নাত অবিস্মরণীয় চমকপ্রদ ইতিহাস।

বাগদাদে বাস করতেন তখন বিখ্যাত আউলিয়া হজরত মোমশাদ আল দীনওয়ারী র.। নূরে নূরে ভরপুর ছিলো তাঁর পবিত্র দরবার। আল্লাহ্ প্রেমিকগণ

তাঁদের প্রেম পিপাসা মিটাবার জন্য উন্মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটে যেতো সেই নূরানী মহফিলের দিকে।

একদিন এলেন সেই সৌম্যকান্তি যুবক যাঁকে দেখেই মুগ্ধ হলেন হজরত মোমশাদ র. আগ্রহ ভরে মুরিদ করলেন তাঁকে। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'বৎস, কি নাম তোমার?'

পূর্ণ আদবের সঙ্গে উত্তর দিলেন যুবক, 'এই অধমকে লোকে আবু ইসাহাক শামী বলে ডাকে।'

পীর ও মোর্শেদ হজরত মোমশাদ দীনওয়ারী বললেন, ' না। আজ থেকে তোমার নাম হবে আবু ইসাহাক চিশ্তী। চিশ্ত উপশহরের অধিবাসীগণ তোমার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রতি পথপ্রাপ্ত হবে। তুমি চিশ্তে যে প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত করবে, তা হবে অনির্বাণ। তোমার রূহানী বংশধরগণের বুকে বুকে অনন্ত কাল ধরে জ্বলবে চিশ্তী চেরাগ। তোমার তরিকার নাম হবে চিশ্তীয়া তরিকা।

পীর ও মোর্শেদের এরশাদ অনুযায়ী সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর হজরত আবু ইসাহাক চিশ্তী র. খোরাসান রাজ্যের অন্তর্গত হিরাতের নিকট চিশ্ত কসবায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন সেখানে। তারপর শুরু করলেন দ্বীন প্রচার প্রসারের কাজ। ধীরে ধীরে বহু সংখ্যক অগ্নিপূজক এবং পৌত্তলিক জনতা তাঁর রূহানী রশ্মির আলোকে পথ চিনে নিলো সিরাতাল মুস্তাকিমের। পূর্ণ শান সহকারে প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর প্রবর্তিত চিশ্তীয়া তরিকা। আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন তিনি চিশ্তীয়া তরিকার প্রথম ইমাম হিসাবে।

তারপর তাঁর রূহানী উত্তরাধিকার লাভ করলেন হজরত আবু মোহাম্মদ আবদাল চিশ্তী (রঃ)। তাঁর অন্তর্ধানের পর চিশ্তের চেরাগের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকলো হজরত খাজা নাসিরুদ্দিন আবু ইউসুফ চিশ্তী (রঃ) এর বুক থেকে। এরপরে এলেন তাঁর খলিফা বিখ্যাত বুজর্গ খাজা কুতুবউদ্দিন মওদুদ চিশ্তী র.। চিশ্তী চেরাগ বুকে নিয়ে সেই যৌবনকাল থেকেই তিনি একান্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করলেন চিশ্তীয়া তরিকা প্রচার প্রসারের গুরুদায়িত্ব।

পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর দরবারে এলে তিনি আগন্তুককে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ অসাধারণের কোনো পার্থক্য করতেন না তিনি। এমনকি দাসদাসীদের প্রতিও করতেন একই রকম ব্যবহার। কারো সঙ্গে সাক্ষাত হলে প্রথমেই সালাম বলতেন তিনি। নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করতেন হজরত মওদুদ চিশ্তী র.।

এ ছাড়াও তিনি ছিলেন অনেক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সাধনা পদ্ধতিও ছিলো অসাধারণ। প্রায়ই তিনি রোজা রাখতেন। কখনো একাধারে

পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হবার পর অতি সামান্য আহার করতেন। কোরআন খতম করা ছিলো তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। এ ছাড়া নফি এছবাত জিকির করতেন অত্যধিক পরিমাণে।

পাঁচশ' সাতাশ হিজরী সনের পহেলা রজব হজরত মওদুদ চিশ্‌তী র. লাভ করেন পরম প্রভুর বিচ্ছেদহীন মহামিলন। বর্ণিত আছে, তাঁর ইন্তেকালের পরেও এক কারামত দর্শন করে প্রায় চার হাজার অমুসলমান কবুল করেছিলেন দ্বীন ইসলাম।

হজরতের ইন্তেকালের পর চিশ্‌তীয়া তরিকার নিশান হাতে নিলেন হজরত খাজা শরীফ জিন্দানী র.। তিনি ছিলেন তৎকালীন জামানার আউলিয়া সম্রাট। ছিলেন নিঃস্ব জনসাধারণের আশ্রয়স্থল। ফকির মিসকিনদের খাদেম বলে নিজের পরিচয় দান করতেন তিনি। বোখারার অন্তর্গত জিন্দান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণকারী এই অসামান্য আল্লাহ্‌ প্রেমিকের দুনিয়ার জীবনের পরিধি ছিলো এক শত বিশ বছর। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে দ্বীন প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার কাজ নিখুঁতভাবে আন্‌জাম দিয়ে তিনি চিশ্‌তী চেরাগকে করেছিলেন আরো বেশী মোহনীয়, আরো বেশী জ্যোতির্ময়।

এই অসামান্য মহাপুরুষেরই সুযোগ্য খলিফা ছিলেন হজরত ওসমান হারূনী। হজরত ওসমান হারূনী চিশ্‌তী র.।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়িয়ূনাকা ইন্নামা ইউবায়িয়ূনাল্লহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম'

অর্থ- (হে মোহাম্মদ স.) নিশ্চয়ই যাঁরা আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছেন তাঁরা যেনো আল্লাহ্‌র নিকট বায়াত গ্রহণ করছেন। আল্লাহ্‌র হাত তাঁদের হাতের উপর।

এই আয়াত শরীফের মর্মকথা হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ স. এর নিকট যাঁরা বায়াত গ্রহণ করেন তাঁরা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌পাকের বান্দা তাঁরাই যাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের সত্তা বিক্রয় করতে সক্ষম হন।

আর আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ অনুগত হতে হলে আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে অবশ্যই আল্লাহ্‌পাকের রসূলের স. নিকট বায়াত গ্রহণ করতে হয়। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রা. এই ভাবেই আল্লাহ্‌পাকের নিকট নিজেদেরকে বিক্রয় করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ পাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিলেন।

হজরত রসুলে পাক স. এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম রা, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়ীন- সবাই এই বায়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নিজেদেরকে আল্লাহ্‌পাকের অনুগত করে দ্বীনের পূর্ণ পাবন্দ হয়েছিলেন এবং দ্বীন প্রচার প্রসার প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এই ভাবেই মারেফাত সাধক আউলিয়াদের মাধ্যমে বায়াতের বিভিন্ন সিলসিলা বা তরিকা প্রবর্তিত হয়েছে।

আমরা জানি রসূলেপাক স. এর মাধ্যম ছাড়া কারো কোনো ইবাদতই আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কবুল হয় না। তাই রসূলেপাক স. এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা জরূরী। আর এই সম্পর্ক স্থাপনের অনুষ্ঠানের নামই হচ্ছে বায়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান।

রসূলে করিম স. বিদায় হজ্বের অনুষ্ঠানে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে যা কিছু পেয়েছি, তার সবকিছু তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি কী?

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রা. সমস্বরে জবাব দিয়েছেন, হাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ স.! আপনি যথাযথভাবে আমাদেরকে সমস্ত কিছু পৌঁছে দিয়েছেন।

রসুলেপাক স. তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাদের উপরে দায়িত্ব– তোমরা পরবর্তীদেরকে পৌঁছে দিবে।

রসূলেপাক স. এর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। তাঁরাও রসূলুল্লাহ্‌ স. এর অনুসরণে এই বায়াতের মাধ্যমে দ্বীনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অংশই তাবেয়ীনদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাবেয়ীনগণ পৌঁছে দিয়েছিলেন তাবে তাবেয়ীনগণের নিকট। এভাবেই বায়াতের সিলসিলা বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রকৃত আল্লাহ্‌ প্রেমিকগণ তাই আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো সিলসিলায় বায়াত গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ্‌ প্রাপ্তি আদতেই যাদের উদ্দেশ্য নয়, তারাই কেবল বায়াত গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। বায়াত হতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণ অথবা বায়াতের সিলসিলা অস্বীকারকারীগণ আসলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে বিক্রয় করতে নারাজ। তারা আসলে প্রবৃত্তির নিকট নিজেকে বিক্রয় করে ফেলেছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই সমস্ত প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণই আবার বায়াতের সিলসিলা বহনকারী পীর মুরিদী জামাতকে 'বেদাতী' বলে আখ্যায়িত করে। আসলে তারা বেদাতের সংজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলেপাক স. এর কোনো উম্মত যদি রসূলেপাক স. এর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তিই তো বেদাতী নামে অভিহিত হবার যোগ্য।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহ্পাকের রজ্জুকে মজবুত করে ধরে রাখো– পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

আল্লাহ্র রজ্জু অর্থ এই বায়াতের রজ্জু। এই রজ্জু আঁকড়ে ধরতে যারা চায় না, তারা তো আল্লাহ্পাকের কথার মর্মই বুঝতে পারেনি।

তাই দেখা গিয়েছে, বায়াতের রজ্জু ধারণকারী পীর মুরিদী সিলসিলার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাঁদের দ্বারাই আল্লাহ্পাক যুগে যুগে পৃথিবীব্যাপী দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন।

আর বায়াত অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণ যুগে যুগে ইসলামের নামে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন প্রকার ফেৎনা ফাসাদ।

এই উপমাহদেশের জনসাধারণ সবাই বায়াত গ্রহণকারী বুজর্গণের মাধ্যমেই পেয়েছেন দ্বীন ইসলাম। তরিকায় বায়াত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের কারণেই আজো ইসলামের শেষ নিশানা জেগে আছে সর্বত্র।

আল্লাহ্পাক যাঁকে হেদায়েত করেন, তিনিই হেদায়েত প্রাপ্ত হন। আর হেদায়েত প্রাপ্তির পথ হলো বায়াত হওয়ার পথ। তাই যুগে যুগে হেদায়েতপ্রাপ্ত যশস্বী আউলিয়া কেরামের জামাত এই পথই নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে এসেছেন।

হজরত মইনুদ্দিন র. দীর্ঘদিন যাবত পথে প্রবাসে ঘুরে বেড়িয়েছেন এই জন্যই। কোথায় সেই নায়েবে নবী স.– যার হৃদয়ে আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য জমা রেখে দিয়েছেন রূহের অন্তহীন পিপাসার সলিল। সেই প্রিয়তম পীর, প্রিয়তম মোর্শেদ কোথায়?

হজরত ওসমান হারূনী র.কে দেখেই মুগ্ধ হলেন হজরত মইনুদ্দিন। সবিস্ময়ে দেখলেন, সম্মানিত অনেক মাশায়েখ হজরত ওসমান হারূনী র. কে ঘিরে বসে আছেন। সেদিনের স্মৃতি ভুলবার নয়। কোনোদিন বিস্মৃত হবার নয়। পরবর্তী সময়ে সেদিনের স্মৃতিচারণ করেছেন হজরত মইনুদ্দিন এভাবে,-

'খ্যাতিমান আউলিয়া পরিবেষ্টিত অবস্থায় হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর মসজিদে বসেছিলেন খাজা ওসমান হারূনী র.। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে আদবের সঙ্গে সালাম করলাম। বায়াত হবার দরখাস্ত পেশ করলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে কবুল করলেন। এরপর পীর মোর্শেদ আমাকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবার নির্দেশ দিলেন। আমি নির্দেশ পালন করলাম। হুকুম হলো,

'কেবলামুখী হয়ে বসো।' আমি কেবলামুখী হয়ে বসলাম। নির্দেশ দিলেন তিনি, 'সুরা বাকারা তেলাওয়াত করো।' আমি তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম। তেলাওয়াত শেষ হলে তিনি পুনর্বার নির্দেশ দিলেন, ষাটবার 'সোবহানাল্লাহ্' পড়ো। আমি তাই পড়লাম। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমার হাত ধরে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে দিলাম। এরপর আমার শরীরে একটি জোব্বা এবং মাথায় একটি তুর্কি টুপি পড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'এক হাজার বার সুরা এখলাস পড়ো।' নির্দেশ মোতাবেক আমি এক হাজার বার সুরা এখলাস পড়লাম।

সুরা এখলাস পাঠ শেষ হলে হজরত পীর মোর্শেদ খাজা ওসমান হারূনী র. এরশাদ করলেন, 'আমাদের তরিকায় একদিন এক রাতের বিশেষ নিয়মের মোজাহাদা করবার নিয়ম আছে। নিয়ম মোতাবেক মোজাহাদা করো এবার।'

এই আদেশ পেয়ে আমি চিশতীয়া তরিকার নিয়ম অনুযায়ী এক দিন এক রাত জিকির ও নামাজে অতিবাহিত করলাম। পরদিন হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত ও কদম মোবারক চুম্বন করে একপাশে আদবের সঙ্গে বসে পড়লাম।

হজরত এরশাদ করলেন, 'আকাশের দিকে তাকাও'। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, আল্লাহ্র পবিত্র আরশ।'

আবার হুকুম করলেন হজরত, 'নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করো।' আমি তাকালাম নিচের দিকে। তিনি প্রশ্ন করলেন,'কতোদূর দৃষ্টি যায়?' আমি বললাম, 'সর্বশেষ পাতাল পর্যন্ত।'

পুনরায় আদেশ করলেন তিনি, 'এক হাজার বার সুরা এখলাস্ পড়ো।' হুকুম অনুযায়ী আমি সুরা এখলাস্ পড়া শেষ করলে তিনি আবার বললেন, 'উপরের দিকে তাকাও।' তাকালাম আমি। তিনি বললেন, 'কি দেখতে পাও?' বললাম, 'হেজাবে আজমত (আল্লাহ্পাকের জাতের সম্মানিত পর্দা)।'

এবার চোখ বন্ধ করতে বললেন তিনি। আমি চোখ বন্ধ করলাম। চোখ খুলতে বললে চোখ খুললাম আবার। এবার তিনি তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন, 'আঙ্গুলের দিকে তাকাও। কি দেখতে পাও এখানে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আঠার হাজার আলম দেখতে পাচ্ছি।'

হজরত বললেন, 'এবার তোমার কাজ শেষ হয়েছে।' তারপর সামনে পড়ে থাকা একটা ইটের দিকে ইশারা করে বললেন, 'ইটটি উঠিয়ে ফেলো।'

নির্দেশ অনুযায়ী ইট উঠিয়ে দেখতে পেলাম কয়েকটি দীনার। হজরত হুকুম করলেন, দীনারগুলি ফকির মিসকিনদের মধ্যে দান করে দাও। আমি দীনারগুলি

ফকির মিসকিনদের দান করে পুনরায় তাঁর নিকট হাজির হলাম। তিনি বললেন, ‘কিছুদিন আমার খেদমতে অবস্থান করো।’

কিছুদিন করতে করতে কেটে গেলো পুরো আড়াইটি বছর। ৫৫২ হিজরী সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি পীর ও মোর্শেদ খাজা ওসমান হারুনীর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এখন তিনি প্রায় পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক।

আল্লাহ্‌পাকের এরশাদ, ‘ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মাআ’স্ সাদেক্বীন।’

‘হে ইমানদার বান্দাগণ। আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।’

সত্যিই আল্লাহ্‌পাকের ভয় যাঁদের অন্তরে রয়েছে, তাঁরাই কেবল সত্যবাদীদের সোহবতে থাকবার তৌফিক প্রাপ্ত হন। সাদেকীন অর্থাৎ সত্যবাদী মানেই বিভিন্ন সিলসিলার পীর দরবেশগণ। তাঁদের সোহবত ও খেদমত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ সত্যিই দুর্ভাগা।

হজরত খাজা মইনুদ্দিন ছিলেন আল্লাহ্‌পাকের প্রিয় বান্দা। তাই তিনি ‘সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক’ ‘এই হুকুমের আমল করতে পেরেছিলেন যথাযথভাবে। তিনি সব সময় তাঁর পীর মোর্শেদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন।

সফরের সময় পীর মোর্শেদের বিছানা, আহারের সরঞ্জাম, পানির মশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস মাথায় করে বহন করতেন তিনি। নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন সব সময়।

নিজ পীরের সোহবতের বরকতে কতো দুর্লভ জ্ঞান আল্লাহ্‌পাক যে নসিব করেন, তা বর্ণনাযোগ্য নয়। সে সময়কার বিভিন্ন সফরের স্মৃতিচারণও তিনি করতেন মাঝে মাঝে।

একদিন হজরত ওসমান হারুনী র. হজরত মইনুদ্দিন চিশতীকে লক্ষ্য করে উপদেশ প্রদান করলেন, ‘কাল কেয়ামতে নামাজের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন। যিনি ফরজ নামাজের যথাযথ হিসাব দিতে পারবেন, তিনিই নাজাত পাবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নামাজের পাবন্দি না করেই দুনিয়া পরিত্যাগ করবে, তাকে দোজখের আগুনে থাকতে হবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, ‘ওয়েল’ সেই

নামাজীদের স্থান, যারা নামাজে আলস্য করে।’ এর ব্যাখ্যা এই যে, ‘ওয়েল’ দোজখের মধ্যে এমন একটি কূপ আছে যার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আজাব হতে থাকবে। যারা নামাজের পাবন্দি না করে, সময়মতো নামাজ আদায় না করে, তাদেরকে ঐ কূপের আজাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

পীর ও মোর্শেদ হজরত ওসমান হারুনী আরো বলেছেন, ‘এলেম দুই রকম। এক রকম এলেম কেবলমাত্র আল্লাহ্‌পাকের জন্য হাসেল করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের এলেম যা সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ আমলও দুই রকম। এক প্রকার আমল যা শুধু মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার আমল হচ্ছে লোক দেখানো আমল। এইরূপ আমলের কোনো প্রতিফল নেই।’

তিনি আরো বলেছেন, ‘যে ইমানের মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অথচ অন্তরে যে বিশ্বাস থাকে সন্দেহবিজড়িত অবস্থায়, মোনাফেকরা সেরকম ইমানের অধিকারী। আর এক রকম ইমান মুখে ও মনে একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত মোমেনগণ এইরূপ ইমানের অধিকারী।’

তিনি আরো এরশাদ করেছেন, ‘মোমেন ঐ ব্যক্তি, তিনটি বস্তু যার সমান প্রিয়– মৃত্যু, উপবাস এবং দরবেশী (ফকিরী)।

তিনি আরো নসিহত করতেন, ‘হালাল খাবার খাও। হালাল উপার্জনলব্ধ বস্ত্র পরিধান করো এবং তওবা করো। সাবধান! হিংসা খুবই মন্দ বস্তু। কখনো মনে হিংসাকে প্রবেশ করবার সুযোগ দিও না। প্রকৃত প্রেমিক ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। দুনিয়ার দিকেও না। আখেরাতের দিকেও না।’

পীর মোর্শেদের সঙ্গে একদিন সিস্তানের দিকে যাচ্ছিলেন হজরত মইনুদ্দিন। সেখানে একটি ইবাদতগাহে গিয়ে পৌঁছলেন দু’জনে।

সেখানে বাস করতেন বিখ্যাত আউলিয়া হজরত সদরুদ্দিন আহমদ সিস্তানী র.। তিনি দর্শনার্থীদের শূন্য হাতে ফিরতে দিতেন না। তিনি তাঁর হুজরা থেকে কিছুনা কিছু সামগ্রী এনে দর্শনার্থীদের হাতে দিয়ে বলতেন, আমি যেনো দুনিয়া থেকে ইমান নিয়ে চলে যেতে পারি, সেই দোয়া করবেন।

হজরত সদরুদ্দিন র. যখন কারো মৃত্যু সংবাদ শুনতেন, তখনই কবরের ভয়াবহ আজাবের কথা স্মরণ করে ডুকরে কেঁদে উঠতেন। এভাবে একাধারে সাতদিন ধরে তাঁর কান্না থামাতে পারতেন না তিনি। তাঁর কান্না কেউ দেখলে সেও কান্না চেপে রাখতে পারতো না কিছুতেই।

এরকম কান্নারত অবস্থায় পীর মোর্শেদসহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন মইনুদ্দিন। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে হজরত সদরুদ্দিন র. বললেন, যার সামনে সবসময় মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, ঘুম, হাসি ও আনন্দে মশগুল হওয়া কি

তার পক্ষে শোভা পায়? আহা, তোমরা যদি তাদের সম্পর্কে জানতে, যারা অন্ধকার কবরে সাপ বিচ্ছুর দংশনের স্বীকার হয়েছে– তাহলে ভয়ে তোমরা নাস্তানাবুদ হয়ে যেতে।

একটু হেসে আবার বললেন হজরত, শোনো, তিরিশ বছর আগের একটি ঘটনা শোনো। বসরায় এক কবরের পাশে বসেছিলাম আমি। আমার পাশে বসেছিলেন কাশফুল কবরের অধিকারী একজন বুজর্গ ব্যক্তি। কবরে আজাব হচ্ছিল তখন। এই দৃশ্য নজরে আসতেই সেই বুজর্গ ব্যক্তি গগনবিদারী চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণেই মৃত্যুবরণ করলেন তিনি। এরকম আজাবের ভয়ে কম্পমান ব্যক্তি আর আমি দেখিনি কখনো।

কাহিনী শেষ করে হজরত সদরুদ্দিন তাঁর অভ্যাস মতো দু'জনকে দু'টি খেজুর দিয়ে বিদায় দিলেন।

এভাবেই একে একে বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন কারামত এবং বিভিন্ন নসিহত শুনে শুনে কেটে যাচ্ছিলো দিন। একবার পীর ও মুরিদ দু'জনে সফর করতে করতে দজলা নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতে তখন প্রবল বান ডেকেছে। কিভাবে পার হওয়া যায়, এই চিন্তা মনে উদয় হতেই হজরত হারূনী র. এরশাদ করলেন, চিন্তা করো না। চোখ বন্ধ করো। নির্দেশ মোতাবেক চোখ বন্ধ করলেন হজরত মইনুদ্দিন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন তিনি। দেখলেন, তাঁরা দু'জনেই নদীর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মইনুদ্দিন প্রশ্ন করলেন, হজরত। কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

হজরত ওসমান হারূনী জবাব দিলেন, পাঁচ বার সুরা ফাতেহা পড়েছিলাম। এ হচ্ছে তারই বরকত।

আড়াই বছর কেটে গেলো এভাবে। এরই মধ্যে হজরত মইনুদ্দিনের বাতেনী তরবিয়াত পৌঁছলো পূর্ণতার প্রান্তসীমায়। তারপর এক মোবারক মুহূর্তে তিনি খেলাফত লাভ করলেন নিজ পীরের কাছ থেকে। হজরত মইনুদ্দিন এবার হলেন হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী। চিশ্‌তী চেরাগ পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হলো তাঁর দরাজ হৃদয়ের শামাদানে।

এরপর হজরত ওসমান হারূনী হজরত মইনুদ্দিন চিশ্‌তীকে এককভাবে সফর করবার অনুমতি দান করলেন।

মোর্শেদ বিচ্ছেদ সহ্য করতে মন রাজী হয় না কিছুতেই। প্রাণাধিক প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মইনুদ্দিনকেও কাছছাড়া করতে ইচ্ছা হয় না হজরত ওসমান হারূনীর। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা তো অন্য। দ্বীনের মহান কাজে আনজাম দিতে তো খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তীকে পরবর্তী সময়ে এককভাবে গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। তাই প্রিয় মোর্শেদের মিলনে নয় বিচ্ছেদে অভ্যস্ত হতে হবে এখন থেকে। এবার যেনো সেই প্রশিক্ষণই শুরু হয়ে গেলো।

প্রিয় মোর্শেদের ইশারা অনুযায়ী আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী। উপর্যুপরি সফর আর কঠোর ইবাদতে কেটে যায় তার দিন। মাস। বছর।

একাধারে সাতদিন রোজা রাখেন তিনি। সাতদিন পর সামান্য পরিমাণ আহার্য দিয়ে এফতার করেন। পরনে একখানা মাত্র চাদর। তাও শতচ্ছিন্ন। ছেঁড়া চাদর নিজ হাতে সেলাই করেন। নশ্বর দুনিয়ার শান শওকতের দিকে কিছু পরিমাণ সময়ের জন্যও ভ্রূক্ষেপ করেন না। দীর্ঘ পথ যাত্রা শেষে ৫৫৬ হিজরী সালে খোরাসান শহরে এসে উপস্থিত হলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী। সেখানে মোলাকাত হলো বিখ্যাত বুজর্গ শায়েখ আহদুদ্দিন কেরমানী র. এর সঙ্গে। তার সংস্পর্শে কাটিয়ে দিলেন তিনি বেশ কিছুদিন।

সে সফরের স্মৃতিচারণ তাঁরই বর্ণনায় এসেছে এভাবে, 'আমি এবং শায়েখ আহদুদ্দিন কেরমানী একদিন কেরমান নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে একজন আল্লাহ্‌পাকের অলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনি ছিলেন অতিশয় দুর্বল। তাঁর এই দুর্বলতার কারণ জিজ্ঞেস করবার আগেই সেই বুজর্গ অলি আল্লাহ্ বলতে শুরু করলেন, হে আল্লাহ্ প্রেমের পথে পরিভ্রমণকারী পথিকবৃন্দ! শোনো। আমি বন্ধু-বান্ধবসহ একদিন এক কবরস্থানের মধ্য দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক কবরের পাশে বসে পড়ে আমরা সবাই হাসি তামাশায় মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন হঠাৎ কবর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, তোমরা জানো নাকি তোমরা যে কবরের পাশে বসে হাসি তামাশা করছো, সে কবরে একদিন তোমাদেরকেও আসতে হবে। স্মরণ করো, কবরের ভয়াবহ আজাবের কথা। এখানে রয়েছে বিষধর সাপ আর যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছুর আজাব।

এই আওয়াজ শুনেই আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ত্যাগ করে এই নির্জন অন্ধকার গুহায় এসে বসবাস করছি। চল্লিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনো সেই কবরস্থানের ঘটনার কথা মনে হলে ভয়ে মাথা তুলতে সাহস পাই না। কাল কেয়ামতের দিনে কি করে আমি যে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিকট আমার মুখ দেখাবো, সেই লজ্জা ও ভয় আমাকে এখনো অশান্ত করে রেখেছে।

সত্যি, বিচিত্র এই দুনিয়া! আর বিচিত্র এই দুনিয়ার মানুষ। পাপে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীর মধ্যে কতো স্থানে এরকম কতো আল্লাহ্‌পাকের প্রিয় বান্দাগণ যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, কে রাখে তার সন্ধান। অনুসন্ধানকারী কয়জন আছেন দুনিয়ায়? আল্লাহ্‌পাকের প্রিয় বান্দাগণের সোহবত থেকে ফায়দা লাভের কামনা কয়জনের অন্তরে বিদ্যমান?

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'সীরু ফিল আরদ্ব' (পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর)।

আল্লাহ্‌পাকের এই হুকুম তামিলের জন্যেই আল্লাহ্‌ প্রেমিক বান্দাগণ যুগে যুগে সফর করেছেন এক স্থান থেকে আর এক স্থানে। লাভ করেছেন গভীর জ্ঞান– অমূল্য অভিজ্ঞতা।

খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী একে একে ভ্রমণ করলেন অনেক স্থান। হামাদান, তাবরীজ আস্তরাবাদ, বোখারা– আরো কতো শহর নগর জনপদ।

বোখারায় তিনি সাক্ষাত পেলেন এক কামেল মহাপুরুষের। তিনি ছিলেন অন্ধ। তাঁর অন্ধত্বের কারণ জানতে চাইলেন মইনুদ্দিন চিশ্‌তী। সেই কামেল আউলিয়া তখন বললেন, 'আমাকে লজ্জা দেবেন না দয়া করে। আমি এক ধ্যানে এক মনে একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের ইবাদতে কালাতিপাত করতাম। কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ করতাম না কখনো। হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তির প্রতি আমি সামান্য সময়ের জন্য মনোযোগী হয়ে পড়লাম। অমনি গায়েব থেকে আওয়াজ হলো, 'হে আল্লাহ্‌ প্রেমের দাবীদার! আল্লাহ্‌ প্রেমের দাবী জানিয়ে অন্য দিকে তোমার নজর নিবদ্ধ হলো কেনো?'

গায়েবী আওয়াজ শুনে লজ্জায় ভয়ে জড়সড়ো হয়ে গেলাম আমি। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো আমার। অনেক কষ্টে আমি উচ্চারণ করতে সক্ষম হলাম 'হে রহমানুর রহিম! যে চোখ আপন প্রিয়জন ব্যতীত অন্যের প্রতি নজর করে, তুমি সে চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দাও। এই দোয়া কবুল হলো সঙ্গে সঙ্গে। শোকরিয়া আদায় করলাম আমি।

আর কতোদিন? প্রিয় মোর্শেদের বিরহ যন্ত্রণা যে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মোর্শেদ দর্শনের জন্য চোখে লেগেছে ঘোর। অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছে অশান্ত অনল।

দীর্ঘ সফর শেষে মোর্শেদ মিলনের জন্য বেচয়েন হয়ে পড়েন খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী। অনুসন্ধান নিয়ে জানলেন, হজরত হারূনী র. এখন বাগদাদে অবস্থান করছেন। বাগদাদের পথে দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলেন খাজা মইনুদ্দিন। দীর্ঘ বিরহের পর হজরত খাজা মিলিত হলেন প্রাণপ্রিয় মোর্শেদের সঙ্গে। হজরত হারূনী হৃদয়ের উত্তরাধিকারী খাজা চিশ্‌তীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সে আনন্দের বন্যায় নিভে গেলো বিরহের প্রজ্বলিত অনল। বেহেশতি শান্তির সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন পীর ও মুরিদ দু'জনেই।

এভাবেই আনন্দের কুসুম কাননে কেটে গেলো কয়েকদিন। সম্বিৎ ফিরে এলে হজরত হারূনী বললেন, আমি হুজরায় প্রবেশ করবো এবার। এতেকাফে উপবেশন করবো। তুমি প্রতিদিন চাশতের সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাত ক'রো। নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিদিন চাশতের নামাজের সময় সাক্ষাত করতে শুরু করলেন খাজা মইনুদ্দিন। এই নিয়মে কেটে গেলো আটাশ দিন। আটাশ দিনের মোর্শেদের এই বিশেষ সোহবতের অভিজ্ঞতা খাজা চিশতী ধরে রাখলেন তাঁর লেখনীতে। রচিত হলো আটাশ দিনের সোহবতের বিবরণসমৃদ্ধ আটাশটি অধ্যায়। এই অমূল্য গ্রন্থের নামকরণ করা হলো 'আনিসুল আরওয়াহ্‌'।

শেষ দিন হজরত ওসমান হারূনী তাঁর নিজের লাঠি, জায়নামাজ এবং খেরকা প্রদান করলেন খাজা মইনুদ্দিনকে। প্রয়োজনীয় নসিহত করে পুনরায় বিদায় দিলেন খাজা মইনুদ্দিনকে। তারপর গভীর ধ্যানমগ্নতার সঙ্গে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন।

আবার শুরু হলো বিরহের দিন। আবার শুরু হলো পথ। প্রবাস। মোর্শেদের ইশারার নিকট পূর্ণ সমর্পিতপ্রাণ খাজা মইনুদ্দিন আবার সফর শুরু করলেন জনপদ থেকে জনপদে। নগর থেকে নগরে।

বদখশান। হেরাত। সাবজওয়ার। আরো অনেক স্থান পরিভ্রমণ করলেন তিনি।

একবার বিখ্যাত দার্শনিক হাকিম জিয়াউদ্দিনের বাসভবনের কাছাকাছি এসে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি। হাকিম জিয়াউদ্দিন ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। দূর দূরান্ত থেকে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী এসে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতো। ফকির দরবেশদের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ একেবারেই ছিলো না।

হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন, অদূরে একজন দরবেশ নামাজরত অবস্থায় আছেন। পাশে তাঁর একজন খাদেম আহার্য প্রস্তুত করছে। হাকিম সাহেব মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাজা চিশতী র. এর কাছে এলেন এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন খাজা মইনুদ্দিনের জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে। সব অহংকার মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলেন তিনি। অভিভূত হয়ে গেলেন হাকিম সাহেব। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, তিনি যেন এখন নতুন মানুষ। তাঁর যাবতীয় দর্শন জ্ঞানের অন্ধকার চিরদিনের জন্য পরাভূত হলো ফকির মোহাম্মদ মইনুদ্দিনের পবিত্র সোহবতের নিকট। নিজের খারাপ ধারণা স্মরণ করে লজ্জিত হলেন তিনি। তওবা করলেন এবং শেষে তাঁর সমস্ত ভক্ত অনুরক্তসহ খাজা মইনুদ্দিনের নিকট মুরিদ হয়ে গেলেন।

নতুন ভূখণ্ডের দিকে পা বাড়ালেন খাজা মইনুদ্দিন। এলেন সমরখন্দে। সেখানে বাস করতেন আবু লায়েস সমরখন্দী র. নামে একজন বিখ্যাত বুজর্গ। তাঁর বাড়ীর সামনে তৈরী হচ্ছিল একটি মসজিদ। কিন্তু সঠিক কেবলা সম্পর্কে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে দেখা দিলো মতভেদ। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে খাজা মইনুদ্দিন উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বললেন, সামনের দিকে তাকাও। দেখো কেবলা কোনদিকে।

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন সবাই, সামনে কাবা শরীফের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি। বাদানুবাদ নিমেষে মিটে গেলো। এখানেও খাজা মইনুদ্দিনের নিকট মুরিদ হলো অনেক লোক।

এরপর আবার সফর শুরু হলো। সফরের পর সফর। একসময় আবার মোর্শেদ বিরহে বেচয়েন হয়ে পড়লেন খাজা মইনুদ্দিন। ফিরে চললেন মোর্শেদের প্রেমদগ্ধ মঞ্জিলের দিকে।

দীর্ঘ দিন পর আবার তিনি লাভ করলেন মোর্শেদের কদমের সুশীতল নিরাপদ আশ্রয়। মোর্শেদ ফিরে পেলেন নয়নমনি মইনুদ্দিনকে।

এবার আর পেয়ারা ফরজন্দকে একা ছাড়লেন না হজরত ওসমান হারূনী। নিজেও তাঁর সফর সঙ্গী হলেন। শুরু হলো কঠোর সাধনা জীবনের আর এক রহস্যময় অধ্যায়।

তখন হিজরী শতাব্দীর ৫৬৩ সাল চলছে। মোর্শেদ ও মুরিদ সেই বছরই শুরু করলেন তাঁদের সুদীর্ঘ সময়ের পরিণত সফর।

হজরত মইনুদ্দিনের বর্ণনায় সে সফরের উল্লেখ এরকম—

'আমি হজরত পীর কেবলার সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কয়েকদিন ক্রমাগত পথ চলার পর আমরা এক শহরে এসে

পৌঁছলাম। গভীর নিশীথে আল্লাহ্‌ প্রেমে উন্মাদ এক দরবেশদের জামাতের সঙ্গে মিলিত হলাম আমরা। কয়েকদিন রূহানী রাজ্যে পরিভ্রমণ করলাম। তারপর পরস্পর রূহানী শুভেচ্ছা বিনিময় করে আবার আমরা সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

কালুজাহ নামক স্থানে এসে আবার যাত্রা বিরতি হলো। সেখানে গভীর অভিনিবেশ সহকারে এতেকাফে কেটে গেলো কয়েকদিন। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম মক্কা অভিমুখে। বহু শহর নগর অতিক্রম শেষে আবার লাভ করলাম চিরকাঙ্খিত খানায়ে কাবার দর্শন। কাবা শরীফের সামনে পীর মোর্শেদ আমাকে সমর্পণ করলেন আল্লাহ্‌পাকের হাতে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে তিনি আমার জন্য হৃদয়স্পর্শী মোনাজাত করে কাটালেন। তাঁর মোনাজাতের সুতীব্র আঘাতে যেনো আল্লাহ্‌পাকের রহমতের দরিয়ায় বান ডাকলো। এলহাম হলো, 'আমি মইনুদ্দিনকে গ্রহণ করলাম।'

এরপর আমরা দু'জনে মদীনা মনোয়ারার পথে যাত্রা করলাম। যখন আমরা রওজায়ে নববী স. এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন প্রিয় মোর্শেদ এরশাদ করলেন, সালাম জানাও।

আমি ভক্তি ও মহব্বতের সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে রসূলে করিম স. এর প্রতি সালাম জানাতেই প্রত্যুত্তর ধ্বনিত হলো, 'হে বিশ্বজগতের কুতুবুল মাশায়েখ। তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।' সেই সুমধুর ধ্বনি আজও আমার অন্তরে অনির্বাণ জ্বলছে। হজরত রসূলে করিম স. এর জবাব শুনবার পর প্রিয় মোর্শেদ আমাকে সুসংবাদ দান করলেন, হে মইনুদ্দিন। তুমি এবার কামালিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছো। সুতরাং তুমি ক্রমাগত নেক আমলের মাধ্যমে তোমার অবস্থাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর করবার সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও।

মদীনা পরিত্যাগ করে আমার পীর মোর্শেদের সঙ্গে বোখারায় উপস্থিত হলাম আমি। সেখানে তাঁর পূর্ব পরিচিত বহু মাশায়েখগণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের মোবারক সোহবতের ফায়দাও আমার নসিব হলো। বোখারা থেকে আওস নগরে পৌঁছলাম আমরা। সেখানে ছিলেন বিখ্যাত আউলিয়া শায়েখ বাহাউদ্দিন আওসী র.। বেলায়েতের জগতে তিনি ছিলেন এক অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। দয়ার্দ্রচিত্ততা এবং দানশীলতা ছিলো তাঁর স্বভাবজাত। যে কোনো লোক তাঁর কাছে মকছুদ পূরণের জন্য দোয়া কামনা করলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে মোনাজাত করতেন। তাঁর দোয়াও বারেগাহে এলাহীর দরবারে তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে যেতো। বিদায় গ্রহণ কালে উপদেশ কামনা করলে তিনি বললেন, 'হে বৎস। তুমি যখন যা কিছু পাও,

আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ্টি লাভের জন্য তৎক্ষণাৎ তা-ই তাঁর পথে ব্যয় ক'রো। অর্থ ও ধনসম্পদ সঞ্চয়ের কামনাকে কোনো সময়ের জন্য অন্তরে স্থান দিও না।'

আওস থেকে আবার বদখশান। বদখশান থেকে আরো কতো কতো জায়গা। কতো পথ। কতো পর্বত। কতো মরুভূমি। বিচিত্র পৃথিবীর প্রতি পরতে পরতে যেনো এক ধ্যানে সফর করে চললেন দুই আত্মভোলা আল্লাহ্‌ প্রেমিক হজরত ওসমান হারূনী র. এবং খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রা.।

এভাবে একাধারে কেটে গেলো সুদীর্ঘ তেরটি বছর। ইতোপূর্বেও কেটে গেছে আরো সাতটি বছর। মোট কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ সফর শেষে প্রবাসী জীবনের ইতি টানলেন হজরত ওসমান হারূনী র.। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি।

তাঁর স্বভাব চরিত্রে দেখা দিলো অপার্থিব পরিবর্তন। অক্লান্ত বিহঙ্গ যেনো এবার নীড়ের নিরাপদ বসবাস চায়। পৃথিবীর প্রতি তাঁর মনোযোগ যেনো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে চিরতরে। মাশুক মিলনের শারাবন তহুরার তৃষ্ণায় যেনো তিনি প্রতিটি পল অতিবাহিত করছেন গভীর উৎকণ্ঠার সাথে।

কাজ শেষ। কাজ শেষ হলে তো চলে যেতেই হয়। এ পৃথিবী তো আর মূল বাসস্থান নয়। প্রবাসী জীবনের অবসান কোন প্রেমিক না চায়।

দিন দিন অসুস্থতা বেড়ে যেতে লাগলো। অবশেষে সেই পবিত্র শুভক্ষণে আল্লাহ্‌পাকের ইশারায় প্রশান্ত চিত্তে নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করলেন হজরত ওসমান হারূনী চিশ্‌তী র.। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আরো দশ বছর মুসাফিরি হালে অতিবাহিত করতে হলো। পীর ও মোর্শেদ র. এর অন্তিম উপদেশ এরকমই ছিলো। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাঁরই পরিত্যক্ত পোশাক পরিচ্ছদ ও পান পাত্রাদি সঙ্গে করে পথে প্রবাসে কাটাতে হলো দশটি বছর।

খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর সুখ্যাতি তখন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই তিনি উপস্থিত হন– সেখানেই তাঁকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকে জনতার ভীড়। এসব পছন্দ নয় তাঁর মোটেও। লোকালয় থেকে দূরে অবস্থান করাই তাঁর পছন্দ। অধিকাংশ সময় তিনি কবরস্থানে রাত্রি যাপন করেন। ভোর হতেই আবার

বেরিয়ে পড়েন নতুন স্থানের উদ্দেশ্যে। অবশ্য কোথাও তাঁর আগমনবার্তা প্রচারিত হয়ে গেলে সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে যথাসম্ভব সাক্ষাত দান করেন তিনি। তারপর আবার সবার অজান্তেই একদিন বিজন পথে নামেন।

এভাবেই পথে প্রবাসে তাঁর দিন কাটে। রাত কাটে। দিন যায়। রাত যায়। বছর গড়িয়ে আসে নতুন বছর।

সময়ের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ৫৮২ হিজরী সালের প্রান্ত সীমায় এসে উপনীত হলেন হজরত খাজা। ঐ বছর আওসের মধ্য দিয়ে ইসপাহান নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। তারপর হাজির হলেন হজরত মাহমুদ ইস্পাহানী র. এর দরবারে।

দরবারে দেখা হলো সেই যুবকের সাথে। সেই সৌম্যকান্তি নূরানী যুবক। নাম কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী। যুবককে দেখে মুগ্ধ হলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী র.। এক লহমায় তিনি চিনে ফেললেন, এই যুবক অসামান্য যোগ্যতাধারী আল্লাহপ্রেমিক। মনে হয় এই যুবকই পরবর্তী সময়ে লাভ করবেন তাঁর হৃদয়ের উত্তরাধিকার।

অনেক আগে থেকেই হজরত মাহমুদ ইসপাহানী র. এর ভক্ত ছিলেন কুতুবুদ্দিন। তাঁর দরবারে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁর কামনা ছিলো, তিনি হজরত ইসপাহানী র. এর নিকট মুরিদ হবেন। কিন্তু অত্যন্ত স্নেহভাজন হলেও হজরত মাহমুদ ইস্পাহানী তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি যেনো মনে মনে প্রতীক্ষা করছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী র. এর জন্য।

তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। খাজা মইনুদ্দিনকে পেয়ে তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন, 'হে আমার প্রিয় দোস্ত! কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার যদিও আমার ভক্ত ও অনুরক্ত, তবু তাঁর রূহানী তরবিয়তের দায়িত্ব আমি আপনার স্কন্ধেই স্থাপিত দেখতে পছন্দ করি। আশা রাখি, আপনার পবিত্র সোহবতের বরকতে তাঁর কামালিয়াত পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠবে।'

প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হলেন খাজা মইনুদ্দিন র. । আনন্দিত হলেন কুতুবুদ্দিনও। হৃদয়ের দাবী কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

পবিত্র বায়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নিজের খেরকা প্রদান করলেন হজরত খাজা। হজরত মাহমুদ ইস্পাহানীও তাঁর খেরকা প্রদান করলেন হজরত কুতুবুদ্দিনকে। উভয় বুজর্গের সম্মিলিত তাওয়াজ্জোহর মাধ্যমে হজরত কুতুবুদ্দিন শুরু করলেন তাঁর সাধনার জীবন।

তারপর একদিন প্রিয় রূহানী ফরজন্দ কুতুবুদ্দিনকে নিয়ে আবার পথে নামলেন হজরত খাজা। আবার শুরু হলো পথ ও প্রবাসের সুখময় অনিশ্চিত জীবন।

প্রাণপ্রিয় মোর্শেদের বিয়োগ ব্যথায় অন্তরের যে উদ্যান পুষ্পশূন্য হয়ে গিয়েছিলো, কুতুবুদ্দিন যেন সেই বিরান বাগানে আবার ফিরিয়ে আনলেন পুষ্পসম্ভাবনার বেহেশতী আনন্দ।

মুরিদ ও মোর্শেদের ছোট্ট কাফেলা এগিয়ে চলে পথ থেকে পথে। প্রবাস থেকে প্রবাসে। আল্লাহ্ প্রেমের মহাসমুদ্রে যেনো পাল উড়িয়েছেন দুই অসীম সাহসিক নাবিক।

তখন চলছে হিজরী ৫৬২ সাল। সেই পবিত্র সফরের স্মৃতিচারণ হজরত কুতুবুদ্দিনের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে এরকম ভাবে–

হজ্বব্রত পালনের জন্য মনস্থির করলাম আমরা। একদিন বাদ ফজর কিছুক্ষণ পর আমরা এক শহরে এসে যাত্রাবিরতি করলাম। সেখানে এক আল্লাহ্ প্রেমিক বুজর্গের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। অতিরিক্ত চিন্তা ক্লিষ্টতার কারণে ছিলেন ক্ষীণকায়।

আমরা বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে সালাম করলাম। সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে তিনি বললেন, প্রিয় সাথীবৃন্দ। আমি হজরত শায়েখ আসলাম তুসী র. এর একজন অধস্তন বংশধর। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর যাবত আমি এরকম বিষণ্নতা ও চিন্তাক্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছি। আমার প্রেমাস্পদের ধ্যানেই অতিবাহিত হয়েছে আমার সুদীর্ঘ অতীত। আমি এতোদিন সচেতনভাবে দিন রাত্রির পার্থক্য অনুভব করতে সক্ষম হইনি। তোমাদের সংস্পর্শে এসে এতো দিন পরে যেনো আমার চৈতন্যোদয় হলো। আমার মনে হয় তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনোদিনও দেখা হবে না। তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। কথাগুলি স্মরণ রেখো। কাজে লাগতে পারে তোমাদের। স্মরণ রেখো তোমরা তরিকত ও মারেফাতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছো। দুনিয়ার সামগ্রীকে প্রাধান্য দিও না কখনো। সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করো না কোনোদিন।

লোকালয় ও জনকোলাহল থেকে সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করবে। নির্জনবাসই উত্তম নিবাস।

স্বাভাবিকভাবে যা কিছু ধন সম্পদ হস্তগত হয়, তার সমস্তই অকাতরে আল্লাহ্পাকের পথে ব্যয় করে ফেলবে। নিজের জন্য কোনো কিছু অবশিষ্ট রেখো না যেনো।

মনে রেখো, সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রেম আর আল্লাহ্পাকের প্রেম কখনো একত্রিত হতে পারে না।

হিজরী ৫৮৩ সাল।

মক্কা মোয়াজ্জমায় এসে পৌছলেন হজরত খাজা চিশ্তী এবং হজরত কুতুবুদ্দিন। তখন হজের মওসুম। আল্লাহ্ প্রেমের উত্তাল জোয়ারে দেশ বিদেশ থেকে আগত অগণিত আল্লাহ্ প্রেমিকগণ আত্মহারা। আকাশে বাতাসে প্রতিনিয়ত অনুরণিত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখময় সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন অনুরণন, লাব্বেয়েক। আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। লা শরীকালাকা লাব্বায়েক। হে প্রভু আমি হাজির। হে প্রভু আমি হাজির, তোমার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাজির।

একে একে শেষ হলো হজের সমুদয় অনুষ্ঠান। তবুও আল্লাহ্ প্রেমের ঘোর কাটে না কিছুতেই। প্রেমবন্দনা আর তাওয়াফের মাধ্যমেই অতিবাহিত হচ্ছিল অধিকাংশ সময়। একদিন নামাজরত অবস্থায় শুনলেন, অদৃশ্য জগত থেকে আগত সুন্দর সুসংবাদ, হে মইনুদ্দিন। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তুমি আমার কাছে যাচ্ঞা করো। আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করবো।

হজরত মইনুদ্দিন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত অবস্থায় সেজদাবনত হলেন। আরজ করলেন, মেহেরবান প্রভু। তুমি মইনুদ্দিনের তরিকার মুরিদগণকে ক্ষমা করে দাও।

জবাব এলো, 'হে মইনুদ্দিন! তুমি আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি তোমার মুরিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তরিকার প্রতি অটল থাকবে, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিব।'

এবার অন্তর প্রশান্ত হলো হজরত মইনুদ্দিনের। অদৃশ্য ইশারা অনুযায়ী তিনি প্রিয় ফরজন্দ কুতুবুদ্দিনকে নিয়ে এবার যাত্রা শুরু করলেন মদীনার পথে।

পথ শেষ হয় না কেনো? সেই দয়াল নবীর সন্নিধানে উপস্থিত হবার জন্য যে অন্তর পল পরিমাণ সময়ও ক্ষেপণ করতে রাজী নয়। সত্যি। প্রেমের পথ কতো বিচিত্র। এক পিপাসা নিবৃত্ত হলে আর এক পিপাসায় উন্মুখ হয়ে যায় অন্তরের অলিগলি।

মদীনার উপকণ্ঠে এসে মসজিদে কোবায় অবস্থান করলেন খাজা মইনুদ্দিন। মদীনায় হিজরতের পথে এখানে রসুলে করিম স. অবস্থান করেছিলেন কিছুদিন। এই মসজিদেই তিনি প্রথম প্রবর্তিত করেছিলেন জুমআর নামাজ। খাজা মইনুদ্দিন সেই দ্বীনের নবীর অনুসরণের বরকত লাভের জন্যই মদীনায় প্রবেশের পূর্বে মসজিদে কোবায় এতেকাফে সময় অতিবাহিত করলেন।

তারপর চিরকাংখিত নিরাপত্তার প্রতীক রওজায়ে নববী স. এর সফর যেনো পূর্বের কোনো সফরের মতো নয়।

অবিশ্রান্ত নূরের ঝর্ণাধারার মতো সমস্ত সত্তা সিক্ত হয়ে উঠছে। এই নেয়ামতের বৈশিষ্ট্য অবর্ণনীয়।

এখানে আল্লাহ্‌র রসূল স. এর নিকট থেকে হজরত মইনুদ্দিন লাভ করলেন আর এক অবিস্মরণীয় সুসমাচার। হজরত রসূলেপাক স. জ্যোতির্ময় অবয়বে আবির্ভূত হয়ে জানালেন, প্রিয় মইনুদ্দিন। তুমি আমার দ্বীনের মইন (সাহায্যকারী)। আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের বেলায়েত প্রদান করলাম। হিন্দুস্থান বুৎপরোস্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত। তুমি আজমীরে যাও। সেখানে তোমার মাধ্যমে পবিত্র ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

সুসমাচার শুনে পরিতৃপ্ত হলেন খাজা মইনুদ্দিন। পরক্ষণেই চিন্তিত হলেন তিনি। কোথায় আজমীর? বিশাল হিন্দুস্থানের কোন দেশে আছে রসূল নির্দেশিত আজমীর?

চিন্তিত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন খাজা মইনুদ্দিন। সেই অবস্থায় তিনি দেখলেন, হজরত মোহাম্মদ স. তাঁর শিয়রে উপবিষ্ট। তিনি তাঁকে আজমীর শহরের দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে দিয়ে দিলেন প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনা। এরপর দয়াল নবী স. তাঁর হাতে দিলেন একটি সুমিষ্ট আনার। তারপর তাঁর জন্য দোয়ায়ে খায়ের করে যাত্রা শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

সফর শুরু হলো আবার। সঙ্গে সাথী কুতুবুদ্দিন। একান্ত জনের এই ক্ষুদ্র কাফেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো হিন্দুস্থানের দিকে।

আল্লাহ্‌পাকের দুই মাহবুব বান্দা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেন। পাড়ি দেন লোক লোকালয়। নির্জন প্রান্তর। পাহাড়ী পথ। ধূলিধূসর মরুভূমি।

সামনে বিজয়ের ব্যাকুল হাতছানি। বুৎপরোস্তি পীড়িত হিন্দুস্থানের বুকে এবার জ্বালাতে হবে চিশ্‌তী চেরাগের অনির্বাণ আলো। সে আলোর পট ভূমিকায় পূর্ণ শান সহকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সর্বকালের সর্বসময়ের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম দ্বীন ইসলাম। সুসময়। সামনে সুখময় সুসময়।

লাহোর।

এখানে যাত্রাবিরতি করলেন খাজা মইনুদ্দিন র.। তাঁর মনে পড়ে গেলো হজরত বড়পীর র. এর সেই মূল্যবান উপদেশ। তিনি বলছিলেন..... পথে পড়বে ভাতীসা রমস্থ নামে এক স্থান। সে স্থানে আছে সিংহতুল্য এক মর্দে মুমিন। তাঁর কথা মনে রেখো তুমি।

খাজা মইনুদ্দিন জানতে পারলেন, এই লাহোরেই সেই সিংহতুল্য মর্দে মুমিনের মাজার শরীফ। তাঁর মোবারক নাম হজরত দাতাগঞ্জে বখশ র.। এই মহান বুজর্গের রূহানীয়াত থেকে ফায়দা অর্জনের বাসনায় একাধারে দুই মাস তাঁর মাজার শরীফে অবস্থান করলেন খাজা মইনুদ্দিন র.। তারপর রওয়ানা হলেন সামনের দিকে। এবারের গন্তব্য দিল্লী।

এগিয়ে চললো খাজা মইনুদ্দিন র. এর বেহেশতী কাফেলা। এখন আর কাফেলা দুইজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘ পথ যাত্রায় কতবার যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। আর সে সময় সঙ্গে জুটেছে কিছু খাঁটি আল্লাহ্‌র অনুরক্ত ফকির দরবেশ। ক্রমে ক্রমে তাঁদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে চল্লিশে। চল্লিশ জন ফকির দরবেশের কাফেলা নিয়ে খাজা মইনুদ্দিন এগিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে। পৃথিবীর কোন্ শক্তি আর প্রতিহত করতে পারে এই জ্যোতির্ময় কাফেলার সুনিশ্চিত বিজয়কে।

সঙ্গী সাথীসহ দিল্লী উপস্থিত হলেন খাজা মইনুদ্দিন র.। দিল্লীর শাসক তখন হিন্দুরাজা খাণ্ডেরাও। আজমীর অধিপতি পৃথ্বিরাজের ভ্রাতা ছিলেন তিনি। পৃথ্বিরাজই তাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করেছিলেন।

রাজমহলের অদূরেই নির্মিত হলো ফকির দরবেশদের ডেরা। নির্ভয়ে তাঁরা শুরু করলেন তাঁদের নিয়মিত ইবাদত বন্দেগী। শিরক কলুষিত দিল্লীর বাতাসে ধ্বনিত হলো, আল্লাহ্ প্রেমের উদাত্ত আহবান। আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ মহান। ধ্বনিত হলো, হাইয়্যাআ'লাস্ সালাহ হাইয়্যাআ'লাল ফালাহ। নামাজের জন্যে এসো। মঙ্গলের জন্য এসো। শিরিকের তমোরাশির মধ্যে

প্রজ্বলিত হলো চিশ্‌তী প্রেমের পবিত্র প্রদীপ। প্রেমের আঘাতে কুফরির কুল ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রবহমান নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে চললো দ্বীন দিল্লীর অলিতে গলিতে। অন্তহীন সে গতি যেনো সমস্ত হিন্দুস্থানকে নিমজ্জিত করতে চায়।

মুশরিকদের হিংস্রতার অভিঘাত অম্লান বদনে বুক পেতে ঠেকালেন তিনি। নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যাঘাত হানলেন প্রেম দিয়ে। ঘৃণার অন্ধকারে আনলেন উদারতার উজ্জ্বলিত ঊষা।

তিনি তো এক অসামান্য নায়েবে নবী। হজরত রসূলেপাক স. এর মতোই তাই তিনি প্রতিকূল অন্ধকারে হয়ে উঠলেন তাঁরই স. এর মতো বিশ্বপ্রেমের প্রতিভু।

ক্রমে ক্রমে এ আরো প্রসারিত হয়ে গেলো দিকে দিকে। দিল্লীর আধ্যাত্মিক দৈন্যতায় এলো ইমানের জ্যোতির্ময় জোয়ার। পিতৃধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে লোক এসে প্রবেশ করতে থাকলো আল্লাহ্‌ মনোনীত একমাত্র ধর্ম দ্বীন ইসলামের সুবাসিত কাননে। বিরোধিতা যেমন বাড়তে থাকলো। তেমনি বাড়তে থাকলো বিজয়ের বিরতিহীন অভিঘাত।

কিন্তু এখানে তো নয়। এগিয়ে যেতে হবে আরো সম্মুখে। রসূলেপাক স. এর নির্দেশিত আজমীরের আকর্ষণ এক সময় উদ্বেলিত করে তুললো খাজা মুইনুদ্দিন র. এর অন্তরাঙ্গনকে।

দিল্লীর কুতুব হিসাবে তিনি নির্বাচিত করলেন হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র.কে। দ্বীন প্রচার প্রসার এবং নও মুসলিমের বিরাট কাফেলার হেফাজতের দায়িত্ব এসে পড়লো হজরত কাকীর স্কন্ধে। প্রিয় মোর্শেদের নির্দেশ। গোলাম কি তার অন্যথা করতে পারে?

দীর্ঘদিন একীভূত বসবাসের পর এসে পড়লো বিচ্ছেদের ব্যথিত অধ্যায়। খাজা মইনুদ্দিন র. তাঁর আত্মোৎসর্গকারী ফকির দরবেশদের কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হলেন আজমীর অভিমুখে। পিছনে পড়ে থাকলো দিল্লী। দিল্লীর শোকাকুল জনতা। আর দিল্লীর নবনিযুক্ত কুতুব, হজরত বখতিয়ার কাকী।

আল্লাহ্‌পাক তাঁকে হেফাজত করুন। সফল করুন।

আজমীর শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন হজরত খাজা মইনুদ্দিন। সফরসঙ্গীগণ পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেই হয়।

এই সেই প্রতীক্ষিত শহর। এই সেই হিন্দুস্থানের বেলায়েতের প্রতিশ্রুত কেন্দ্রভূমি, আজমীর। চারিদিকে পাহাড়। পাথর। মরুভূমি।

নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়া। এখানেই ক্লান্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে উপবেশন করলো দরবেশদের কাফেলা।

স্থানটি ছিলো রাজা পৃথ্বিরাজের উষ্ট্র বাহিনীর বিশ্রামস্থল। রাজার লোকেরা বাধা দিয়ে বলে উঠলো, এই স্থানটি রাজার উষ্ট্রশালা। এটা কোনো বিশ্রামাগার নয়। আপনারা সত্বর এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

বিস্মিত হলেন খাজা চিশতী রা.। সারাদিন চরে ফিরে উটের দল তো এখানে এসে উপস্থিত হবে সেই সন্ধ্যা বেলায়। অথচ লোকগুলো তাঁদেরকে এখনই তাড়িয়ে দিতে চায়। বললেন তিনি, ঠিক আছে আমরা তো চললাম। তোমাদের উটই এখানে বসে বসে বিশ্রাম করুক।

পরিশ্রান্ত কাফেলা আবার এগিয়ে চললো সামনের দিকে। অদূরে আনা সাগর। সাগর তো নয়। এটি একটি বিশাল হ্রদ। লোকে বলে আনা সাগর। আনা সাগরের পাড় ঘেঁষে অজস্র মন্দির। হজরত খাজা আনা সাগরের তীরবর্তী একটি ছোট টিলায় বসবাসের স্থান নির্বাচন করলেন।

সাঁঝ হয়ে গেলো। অস্তাচলগামী সূর্যের লাল আলোয় রঞ্জিত হলো সমস্ত পশ্চিম আসমান। মন্দিরে মন্দিরে কর্ণবিদারী আওয়াজে বেজে উঠলো পূজার ঘণ্টাধ্বনি। প্রজ্বলিত হলো শত সহস্র পূজার প্রদীপ।

শত শত ঘণ্টাধ্বনি ভেদ করে অন্যদিকে উচ্চারিত হলো পৌত্তলিকতা বিধ্বংসী শাশ্বত সত্যের চিরন্তন আওয়াজ, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর- আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ........... আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ.... আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

তারপর সালাত। প্রেমের অনির্বচনীয় জান্নাতী মজলিশ। দরবারে দীদারে এলাহীর অক্ষয় আয়োজন। সালাত- মেরাজুল মোমেনীন- চিরস্নিগ্ধ সালাত।

সে রাতেই মুখে মুখে আগন্তুক দরবেশের আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সকালে মহারাজ পৃথ্বিরাজও শুনতে পেলেন এক অদ্ভুত সংবাদ। উষ্ট্রশালার কর্মচারীগণ এসে অধোবদনে জানালো, গতকাল সন্ধ্যায় যথারীতি সব উট উষ্ট্রশালায় বিশ্রামের জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু সকালে দেখা গেলো, সব উটগুলো শুয়েই আছে। উঠবার নাম নেই কারো। চারণভূমিতে নিয়ে যাবার জন্য রাখালগণ উটগুলোকে তাড়া করলো অনেক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। উটগুলো বসে আছে তো আছেই।

এই সংবাদের সঙ্গে সেই মুসলমান দরবেশ দলের ঘটনাও বর্ণিত হলো রাজার কাছে। দরবেশ দলের নেতা উষ্ট্রশালা পরিত্যাগের সময় বলেছিলেন, ‘তোমাদের উটই এখানে বসে বসে বিশ্রাম করুক।’

ইতোপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে মুসলমান ফকিরদের সম্পর্কে এরকম অনেক কথা রাজার কর্ণগোচর হয়েছিলো। চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজা। তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো সহসাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী রাজমাতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এক মুসলমান ফকিরের অভিসম্পাতেই পৃথ্বিরাজের রাজ্য নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে। একি তবে সেই ফকির? মনে হয় তাই। তা হলে পৃথিবীতে এতো স্থান থাকতে এই আজমীরে একেবারে তাঁর কাছাকাছি এসে সেই ফকির আস্তানা পাতবেন কেনো?

চিন্তিত হয়ে পড়লেন মহারাজা। বললেন, সেই ফকিরের কথাতেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যাও। তোমরা তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো।

রাজ আদেশ পালন করলেন কর্মচারীবৃন্দ।

হজরত খাজা বললেন, যাও। এ অবস্থা আর থাকবে না।

উটশালায় ফিরে এসে লোকজন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো, উটগুলো আবার রাখালদের নির্দেশে স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে আজমীরের অবস্থান্তর ঘটতে শুরু করলো। কৌতুহল নিবারণের জন্য লোকজন যাতায়াত শুরু করে দিলো হজরত খাজার আস্তানায়। তাঁর পবিত্র চেহারা আর তাঁর সাথীদের প্রাণখোলা মধুর চরিত্রের প্রভাবে সম্মোহিত হতে লাগলো আজমীরবাসী। হজরত খাজার সোহবতের বরকতে তাঁদের অন্তরের অন্ধকার সরে যেতে লাগলো। অন্তরগত চাপা পড়া সহজাত আল্লাহ্ প্রেমের নহরে ডাকলো নতুন বান। ইমানের সালসাবিল তাপদগ্ধ মনোভূমিতে আনলো আবাদীর আহবান। জাগলো। জেগে উঠলো আজমীরের সত্যান্বেষী জনতা।

আতংকিত হলো পুরোহিত সম্প্রদায়। আতংকিত হলো শোষক বর্ণবাদী হিন্দু সমাজ। ভীত শংকিত হলো হিংস্র রাজপুরুষগণ এবং সামন্তবাদী সম্রাট।

এ কেমন ফকির। নিরস্ত্র। নিরন্ন। শতচিন্ন বস্ত্রাবৃত এ কোন ভূলোকের নির্ভীক বাসিন্দা এরা। এদের ভয় নেই। ভীতি নেই। শাদা কালো ভেদাভেদ নেই। তাঁরা একই সঙ্গে খায়। ওঠে। বসে। একই সঙ্গে কাজ করে। দিনে রাতে পাঁচ বার অবোধ্য ভাষায় কানে আঙুল দিয়ে একজন চিৎকার করতে থাকে। সে চিৎকারের আওয়াজে শব্দহীন হয়ে যায় মূর্তিপূজার শত ঘণ্টা ধ্বনি। দেবমূর্তি থর থর করে কাঁপে। তার সাথে কাঁপে ব্রাহ্মণদের কলুষিত বুক।

পাপিষ্ঠ। যবন। ম্লেচ্ছ। দেবদ্রোহী অপবিত্র মুসলমান। এদেরকে ধ্বংস করে দিতে হবে সমূলে। কমপক্ষে আজমীর ত্যাগে বাধ্য করতেই হবে যবনদেরকে।

ইসলাম বিদ্বেষী ক্রোধান্ধ শহরবাসী রাজদরবারে গিয়ে অভিযোগ করলো, মহারাজ। একদল ম্লেচ্ছ ফকির আমাদের দেবালয়ের সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। তাঁদের প্ররোচনায় পড়ে বহু হিন্দু মুসলমান হয়ে গিয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা। তারা আনা সাগরের পবিত্র পানি ব্যবহার করে। তাদের স্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায় আনা সাগর। এই ক্ষণে যদি তাদেরকে বিতাড়িত করা না হয়, তবে দেবরোষে ধ্বংস হয়ে যাবো আমরা।

অভিযোগ শুনে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলো রাজা পৃথ্বিরাজ। তার ক্ষত্রিয় রক্ত ক্ষমতামদমত্ততার আঘাতে টগবগ করে ফুটে উঠলো। অহংকারের নিচে চাপা পড়লো তার মায়ের সদুপদেশবাণী। এতো বড় সাহস এই যবন দলের। দেবালয়ের সামনে বসে তারা শুরু করেছে দেবদ্রোহী অভিযান। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না কোনোমতেই। তিনি একদল সৈন্যকে আদেশ দিলেন, এক্ষুণি রাজ্য থেকে বিতাড়িত করো যবন ফকির দরবেশদেরকে।

ঝাঁপিয়ে পড়লো সৈন্যদল। এক্ষুণি তারা উৎখাত করে দিবে দরবেশদেরকে।

হজরত খাজা নির্বিকার। আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য কামনা করলেন তিনি। আক্রমণকারীরা হলো অন্ধ। কারও শরীর হয়ে গেলো নিঃসাড়। কেউ হলো ভূতলশায়ী।

নিরুপায় হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো তারা। দয়ার সাগর গরীবে নেওয়াজ খাজা চিশতী র. ক্ষমা করে দিলেন তাদেরকে। উদারতার জ্যোতির্ময় অভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হলো অন্তরের অহমিকা। ইমানের অনির্বাণ আলোয় আলোকিত হলো অন্তর বাহির। যেনো ধ্বনিত হলো সেই চিরন্তন নিষ্কলুষ বাণী, ‘সত্য এসেছে। মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসৃত হয়ে থাকে।’

রাজা পৃথ্বিরাজ ভেবে কূল পান না, কি করবেন তিনি। সমরাস্ত্র, সুসজ্জিত সৈন্যদল, পরাক্রম– কোনো কিছুই যে আর কাজে আসছে না। এক দূরাগত ম্লেচ্ছ যবন ফকিরের নিকট তাকে পরাজয় বরণ করতে হবে? কি করবেন তিনি এখন? ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর এই নিরস্ত্র ফকিরের আনুগত্য স্বীকার করবেন? না তাকে বিতাড়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন?

এ কি বিস্ময়কর সংকট। চুপ করে থাকলেও বিপদ। বিরুদ্ধাচরণ করলেও সমস্যা। দিন দিন দলে দলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ গ্রহণ করছে তার একত্ববাদী ধর্মমত। এভাবে চুপ চাপ থাকলে তো অচিরেই নব্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে রাজ্যের শাসন ভার। আবার বিরুদ্ধাচারণ করলেও সাফল্যের আশা দূরপরাহত।

রাজা ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষদের দ্বারা প্রতিরোধ করতে হবে ফকিরকে।

যোগমন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাত রাম দেও এর শরণ নিলেন রাজা। তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'যোগমন্ত্র বলে বিতাড়িত করতে হবে এই যবন ফকিরকে। নয় তো সনাতন হিন্দু ধর্ম আর রক্ষা করা যাবে না কিছুতেই।'

রামদেও রাজী হলেন। তাঁর দীর্ঘ সাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিতে হজরত খাজা চিশতী র.কে পরাস্ত করবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন গিয়ে হজরতের দরবারে। খাজা মইনুদ্দিন তখন ছিলেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন হজরত। দৃষ্টিপাত করলেন রামদেও হজরতের জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন রামদেও। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। অন্ধকারে আলো জ্বললে মুহূর্তেই যেমন করে অন্ধকার অপসারিত হয়। হজরত খাজার কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়লেন রামদেও। নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন ইসলাম। হজরত খাজা তাঁর নাম রাখলেন মোহাম্মদ সাদী।

রামদেও এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে রাজা ক্ষোভে দুঃখে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিদুষী মায়ের উপর্যুপরি উপদেশের ফলে একান্ত বাধ্য হয়ে সংযত হতে হলো তাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা দিলো আরেক বিপদ।

আনা সাগরের পানি উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং পুরোহিত সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারতো না। নিম্নবর্ণ হিন্দুরা মনে করতো এ তাদের ধর্মীয় বিধান। কিন্তু মুসলমানগণ কি বর্ণভেদের ধার ধারে? একদিন আনা সাগরে অজু করতে গেলেন হজরত খাজার একজন শাগরেদ। পুরোহিতরা অপমান করে তাড়িয়ে দিলো তাঁকে। সেই সরল প্রাণ শাগরেদ সমস্ত ঘটনা জানালেন পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজাকে।

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদীকে আনা সাগর থেকে এক ঘটি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক আনা সাগর থেকে এক ঘটি পানি আনতেই দেখা গেলো এক আশ্চর্য দৃশ্য। কোথায় সাগর? সব পানি তার শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে।

এই অলৌকিক ঘটনা রাজার কানে গিয়ে পৌঁছলো। বিব্রত বোধ করলেন রাজা। রাজা বুঝলেন, মুসলমান ফকিরদেরকে আনা সাগরের পানি ব্যবহার করতে না দেয়ার কারণেই এই দুরবস্থা ঘটেছে। হজরত খাজার নিকট নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিলেন রাজা।

প্রমাদ গুণলেন পুরোহিত সম্প্রদায়। কিন্তু উপায় তো নেই। তারা হজরত খাজার সামনে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। এছাড়া সাধারণ জনতার এক বিরাট দল গিয়ে হাজির হলো পানি প্রার্থনার জন্য।

মানুষের দুর্দশা দেখে অন্তর দ্রবীভূত হলো হজরত খাজার। তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তারপর মোহাম্মদ সাদীকে পুনরায় ঘটিতে ভরা পানি আনা সাগরে ঢেলে দিবার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালিত হলো। তখন আবার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো সবাই, ঘটির পানি ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো বিশাল হ্রদ, আনা সাগর। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে অনেক লোক স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করলেন সত্য ধর্ম দ্বীন ইসলাম।

রাজা পৃথ্বিরাজ ভেবে পান না কি করে এই মুসলমান ফকিরকে প্রতিহত করা যায়। একদিন রাজ দরবারে অজয় পালের কথা তুললো একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তার পরামর্শ অনুযায়ী বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক অজয় পালকে ডেকে আনলেন রাজা। তারপর তাকে খুলে বললেন সবকিছু। রাজা বিশেষ রাজকীয় পুরস্কারের প্রস্তাব রাখলেন অজয় পালের নিকট।

অজয় পাল তার সর্বপ্রকার শক্তি দিয়ে ঘায়েল করবার চেষ্টা করলেন হজরত খাজাকে। কিন্তু মিথ্যা কি কখনো সত্যকে প্রতিহত করতে পারে?

অজয় পালের বোধোদয় হলো। বুঝলেন তিনি, 'সত্য এসেছে, মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে।' অজয়পাল তার সঙ্গী সাথী অনুচরসহ কবুল করলেন দ্বীন ইসলাম। হজরত খাজা তাঁর নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ বিয়াবানী।

সংবাদ শুনে মুষড়ে পড়লেন রাজা। ভাবলেন তিনি, সংঘর্ষমুক্ত সহাবস্থানের নীতিই এখন থেকে মেনে চলতে হবে। তবু যদি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তাও সম্ভব হলো না শেষ পর্যন্ত। সত্য মিথ্যার সংঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী। সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো এভাবে—

রাজদরবারের একজন কর্মচারী ছিলেন হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. এর একান্ত অনুরক্ত। মুসলমানও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। রাজা এ কথা জেনেও তাঁকে পছন্দ করতেন খুব। পছন্দ করতেন তাঁর উত্তম স্বভাব, বিশ্বস্ততা ও সততার জন্য। কিন্তু রাজদরবারের অন্যান্য সদস্যদের প্ররোচনাক্রমে এক সময় সেই মুসলমান কর্মচারীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রাজা। হজরত খাজার কাছে বার বার পরাজিত হবার সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ যেনো হঠাৎ করে গিয়ে পড়লো হজরত খাজার একান্ত ভক্ত সেই রাজ কর্মচারীটির উপর। অবস্থা দেখে সেই মুসলমান রাজকর্মচারী ভেবে পেলেন না, এ অবস্থায় তিনি কি করবেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি হজরত খাজার দরবারে এসে আরজ করলেন, হজরত। যদি রাজার দরবারে আমার জন্য একটা সুপারিশপত্র পাঠান, তবে হয়তো রাজার মনোভাব পূর্বাস্থায় ফিরে আসতে পারে।

পর দুঃখে কাতরপ্রাণ হজরত খাজা একান্ত বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে সেই রাজকর্মচারীটির পক্ষে সুপারিশনামা লিখে পাঠালেন। সেই সঙ্গে জানালেন ইসলাম গ্রহণের উদাত্ত আমন্ত্রণ।

চিঠি পেয়ে রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন পৃথ্বিরাজ। যবন ফকিরের এত বড় স্পর্দ্ধা। রাজকীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখবার কি অধিকার রয়েছে তার? তারপর আবার জানিয়েছে, ধর্মত্যাগ করার আহবান। এতো বড় ধৃষ্টতা? কি ভেবেছে সে! আর্য্য হিন্দু হয়ে, বীর ক্ষত্রিয় হয়ে সেকি শেষে ফকিরের দাসত্ব স্বীকার করবে? অসম্ভব।

মুসলমান কর্মচারীটিকে চাকুরীচ্যুত করলো রাজা। সেই সঙ্গে হজরত খাজার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলো অশালীন বক্তব্য।

সংবাদ শুনে হজরত খাজার প্রেমময় অন্তরেও প্রজ্বলিত হলো রুদ্ররোষের সর্বধ্বংসী আগুন। তিনি একটুকরা কাগজে লিখে পাঠালেন রাজা পৃথ্বিরাজকে—

'মান তোরা যেন্দা বদস্তে লশকরে ইসলাম বছোপর্দম' (আমি তোমাকে তোমার জীবিতাবস্থাতেই মুসলিম সেনাদলের হাতে সমর্পণ করলাম)।

নিদ্রাভিভূত ছিলেন সুলতান শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী। স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন, শ্বেত শুভ্র বস্ত্রাবৃত একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সিংহাসনে সমারূঢ়। তাঁর সমস্ত অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপার্থিব জ্যোতিচ্ছটা।

তাঁর সামনে দণ্ডায়মান অনেক অনুচর। তাঁদের মধ্যে একজন সুলতান ঘোরীকে হাত ধরে একদল সুসজ্জিত মুসলমান সেনাদলের নিকট নিয়ে গেলেন। আর সেই সময় সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যাও। তোমাকে আমি হিন্দুস্থানের শাসন ক্ষমতা দান করলাম।'

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। চমকিত হলেন সুলতান। এ নিশ্চয়ই শুভ স্বপ্ন মনে হলো তাঁর।

সকালে ঘনিষ্ঠজনদের কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন তিনি। সবাই এক বাক্যে বললেন, মনে হয় অচিরেই হিন্দুস্থান করতলগত হবে আপনার। এ স্বপ্ন তারই আগাম সুসংবাদ।

সুলতান মনস্থির করলেন, এবার হিন্দুস্থান অভিযান শুরু করতে হবে। সেনাপতিকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিলেন তিনি। প্রস্তুত হলো সেনাদল। ৫৮৮ হিজরী সালে সুলতান শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন হিন্দুস্থান অভিমুখে। অন্তরে বিগত যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি। সে গ্লানি এবার মুছে ফেলতেই হবে।

ইতোপূর্বে দুই দুই বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করেও সফল হতে পারেননি তিনি। ভেবেছিলেন, সারা ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। রাজাদের মধ্যে চলে পারস্পরিক হানাহানি। বিদ্বেষ। সুলতান ভেবেছিলেন, এই অনৈক্যের সুযোগে একে একে সব হিন্দু রাজাদেরকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হবে সহজেই।

কিন্তু শক্তিশালী পৃথ্বিরাজের জন্যই অভিযান বানচাল হয়ে গেলো শেষ পর্যন্ত। পৃথ্বিরাজ বহিরাগত মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করবার আহবান জানালেন সমস্ত রাজাদেরপ্রতি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাই সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে বাধা দিলো সুলতান বাহিনীকে। তাদের সম্মিলিত

বাহিনীর সৈন্যের তুলনায় সুলতান বাহিনীর সৈন্য ছিলো সংখ্যায় অনেক কম। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করলো সুলতান বাহিনী। কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছু হঠতে হলো শেষ পর্যন্ত। এমনকি সুলতানও কোনোক্রমে বেঁচে গেলেন মৃত্যুর মুখ থেকে। শেষ যুদ্ধ থেকে পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে রাজধানী গজনীতে ফিরে এসেই প্রতিজ্ঞা করলেন সুলতান, হিন্দুস্থানে বিজয় নিশান ওড়াতেই হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে। চরমতম প্রতিশোধ।

দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে দেখলেন সেই শুভস্বপ্ন। আল্লাহ্‌পাক সহায়। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, বিজয় এবার হবেই হবে।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। একদিকে প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুত রাজা পৃথ্বিরাজের অধীনে বিশাল হিন্দু বাহিনী। পৃথ্বিরাজের ভাই বীরবিক্রম খাণ্ডেরাও এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। দেড়শত বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের রাজার অধীনে তারা সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের ময়দানের দিকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তিন সহস্রাধিক হস্তীর ভয়ংকর বাহিনী।

অপরদিকে সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরীর অমিততেজ বীর মুসলিম বাহিনী। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হিন্দু বাহিনীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ইমানের বলে তারা বলীয়ান। এক আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র শক্তির প্রতি নির্ভর করে তারা নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে দুশমন নিধনের সংগ্রামে। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক।

তারায়েনা প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হলো দুই বাহিনীর মধ্যে। বিশাল হিন্দু বাহিনীর সামনে সংখ্যালঘু মুসলিম বাহিনীর অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকারই কথা নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ফলাফল দেখা গেলো অন্যরকম।

যুদ্ধ শুরু হবার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেলো, শত্রু বাহিনীর ব্যুহ তেমন শক্তিশালী নয় এবং আক্রমণকারী অগ্রগামী বাহিনীর আক্রমণও সম্মিলিত এবং সুসংগঠিত নয়। আসলে হিন্দু বাহিনী বিশাল হলেও তা একক বাহিনী নয়। দেড়শত রাজার দেড়শত বাহিনীকে একীভূত করার জন্য যে সম্মিলিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তা অনুধাবন করার আগেই তাদেরকে আসতে হয়েছে মুসলিম বাহিনীর

সামনে। তাছাড়া তাদের ধর্মের শতধা বিভক্ত বর্ণবাদও সৈন্যদের একাত্মতার ব্যাপারে ছিলো প্রধানতম বাধা।

মুসলিম বাহিনীর প্রশিক্ষণ ছিলো মজবুত। তাছাড়া ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই তারা ছিলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম। তাই তাঁদের সুসংগঠিত শক্তি ছিলো আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। আল্লাহ্‌পাকের খাস নেয়ামত স্বরূপ সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা গরীবে নেওয়াজ র. এর রূহানী তাওয়াজ্জোহও ছিলো মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে।

মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো পৌত্তলিক সৈন্যদল। কচু কাটা হতে লাগলো দুশমনেরা। নাস্তানাবুদ হয়ে গেলো বিশাল হস্তি বাহিনী। পালিয়েও নিস্তার নেই। ক্ষিপ্র গতিতে রাজপুত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে যাকে যেভাবে পাওয়া গেলো, তাকে সেভাবেই হত্যা করতে লাগলো মুসলমান সৈন্য বাহিনী।

উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো প্রধান সেনাপতি খাণ্ডেরাও। রাজা পৃথ্বিরাজও সরস্বতী নদীর তীর ধরে পালাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলো না তার। মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়ে গেলো রাজা এবং শেষাবধি হত্যা করা হলো তাকে।

৫৮৮ হিজরী সালের এই ভয়াবহ যুদ্ধে সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী লাভ করলেন নিরংকুশ বিজয়।

আরো সামনে এগিয়ে চললো ঘোরী বাহিনী। এরপর সহজেই এক এক করে সরস্বতী, সামানা ও হাঁশিসহ অধিকৃত হলো দিল্লী। সুলতান দিল্লীর দায়িত্ব দিলেন কুতুবুদ্দিন আইবেককে। তারপর এগিয়ে চললেন আজমীরের দিকে।

তাঁর এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানের সামনে অবনত হলো যুদ্ধে নিহত হিন্দু রাজাদের পুত্রগণ। দেউল নামক স্থানে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করলো অনেক রাজপুত্র। মুসলিম শাসনের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের বিনিময়ে সম্রাট তাদেরকে প্রদান করলেন বিভিন্ন রাজ্যের জায়গীর।

সুলতান এগিয়ে চললেন আজমীর অভিমুখে।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে কাফেলা। শত সহস্র নয়, হজরত খাজা র. এর মাধ্যমে ইসলাম কবুলকারীগণের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ। শুধু আজমীরে নয়, এখন হজরত খাজার জামাত প্রসারিত হয়েছে বিশাল হিন্দুস্থানের কোণায় কোণায়।

দর্শনার্থীদের ভীড় লেগে থাকে সর্বক্ষণ। এ ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিন আগমন করেন অগণিত সত্যান্বেষী মানুষ। প্রতিদিন চলে দ্বীন শিক্ষার পবিত্র মজলিশ। আনা সাগরের তীরে আর স্থান সংকুলান হয় না। এমতাবস্থায় শাদীদেব এবং আব্দুল্লাহ বিয়াবানী প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য আজমীর শহরের একস্থানে আস্তানা স্থাপন করতে অনুরোধ জানালেন হজরতকে। হজরত খাজা তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

শহরের এক স্থানে বিরাট এলাকা জুড়ে শাদীদেবের সম্পত্তি ছিলো। সেখানেও ছিলো মন্দির। মন্দিরে ছিলো অনেক দেবমূর্তি। সে সমস্ত ধ্বংস করে সেখানে নির্মিত হলো সারা হিন্দুস্থানের প্রধান তৌহিদী প্রচার কেন্দ্র। সুলতানুল হিন্দ খাজা চিশতী র. বসবাস শুরু করলেন তাঁর নবনির্মিত হুজরায়। হুজরাকে কেন্দ্র করে আশে পাশে নির্মাণ করা হলো মসজিদ, মেহমান খানা এবং লঙ্গর খানা।

হজরত চিশতী এক মনে এক ধ্যানে এবাদত এবং প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সত্য দ্বীনের দাওয়াত দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি পাঠালেন রূহানী শক্তিতে বলীয়ান সুযোগ্য প্রতিনিধিদের।

ক্রমশঃ বাড়তেই লাগলো মুসলিম কাফেলা।

চিশতী চেরাগের আলোকে আলোকিত আজমীরে সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী যখন পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয় প্রায়। পশ্চিম আকাশের লাল সূর্য যেনো হজরত খাজাকে সালাম জানিয়ে বিদায়ের আয়োজন করছে।

সূর্যাস্ত শেষে ধ্বনিত হলো আজান, আল্লাহ্ প্রেমের হৃদয় পাগল করা আহবান। শিরায় শিরায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো প্রেম প্রবাহ। কাঁপন লাগলো কলিজায়।

সচকিত হয়ে উঠলেন সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী। আজান ধ্বনি শুনে সেদিকে এগিয়ে যেতেই তিনি দেখলেন, একদল নুরানী জান্নাতী মানুষ হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছে সালাতে।

আল্লাহ্ পাক এ বিশাল নিসর্গে কতো শত সৌন্দর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। সবার চেয়ে বেশী সৌন্দর্য দিয়েছেন তিনি মানুষকে। আর মানুষের সৌন্দর্যও পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এই সালাতের মধ্যে। সালাত– প্রেমময় জ্যোতির্দগ্ধ সালাত। সালাতই তো দীদারে এলাহীর প্রধানতম মাধ্যম।

দরবেশদলের নূরানী জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন সুলতান। সালাত শেষে জামাতের ইমামের মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন বাদশাহ। এই তো সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, স্বপ্নে যিনি জানিয়েছেন হিন্দুস্তান বিজয়ের সুসংবাদ। সুলতান শ্রদ্ধাভরে পদচুম্বন করলেন হজরত খাজার। তিনদিন হজরতের মোবারক সোহবতে অতিবাহিত করবার পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি।

তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে লাগলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনিও বায়াত গ্রহণ করলেন দিল্লীর কুতুবসম্রাট খাজা বখতিয়ার কাকী র. এর হাতে। এর পর রাজনৈতিকভাবে এবং রূহানীভাবে পৌত্তলিকতা উচ্ছেদের অভিযান এগিয়ে চললো সমান্তরাল গতিতে। কুতুবুদ্দিন আইবেক ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করলেন মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা। কনৌজ, বেনারস, আরো অনেক স্থানে তিনি উড়িয়ে দিলেন মুসলমানদের বিজয় নিশান।

কিন্তু অস্ত্রবলে তো আর হৃদয় রাজ্য জয় করা সম্ভব নয়। হৃদয় জয় করতে হলে যে শক্তিশালী প্রেমিক হৃদয় প্রয়োজন। যে হৃদয়ে বিরামহীনভাবে জারী থাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ। আল্লাহপ্রেমের অবিনশ্বর নূর প্রতি মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত থাকে যে হৃদয়ে, সেই হৃদয়ই প্রেমাস্ত্রের বলে অধিকার করতে পারে হৃদয়ের সত্যবিমুখ সাম্রাজ্য। অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার অমানিশা ভেদ করে সেই হৃদয়ই তো আনতে পারে ইমানের জ্যোতির্ময় সকাল।

হজরত খাজা সেই বিজয়ের সাধনাতেই বিভোর। তাঁর বহু মেহেনতে গড়া বিশাল প্রচারক বাহিনী তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সেই পবিত্র জেহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলেছেন নতুন নতুন জনপদে। শহরে। নগরে।

সাধনাসমৃদ্ধ জীবনের অনেক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী। বয়স পড়েছে আশির কোঠায়। আল্লাহ্ ও রসূল স. এর প্রেমসমুদ্রের অন্তহীন অতলে পরিভ্রমণ করে কেটে গেছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। সেই অনির্বাণ প্রেমের অনলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে কামনা বাসনা আর সমস্ত রকম মানবিক অভিলাস। অবলুপ্ত সত্তার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সংসার পাতবার সর্বশেষ মোহটুকুও।

জীবনের প্রধান পরিধি অতিক্রান্ত হয়েছে পথে। প্রবাসে। সাধনায়। সৃষ্টিকুলের খেদমতে। তারপর এসেছে আজমীরে স্থায়ী বসবাসের কর্মব্যস্ত অধ্যায়। কর্মের ভীড়ে ফুরসত মেলেনি এতটুকুও। মনেও হয়নি, আর কোনোদিন তিনি প্রবেশ করবেন সাংসারিক জীবনে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ প্রেমিক হজরত রসুলে মকবুল স.ও পালন করেছেন সাংসারিক জীবন।

তাই তিনি স. তাঁর একান্ত আপন রূহানী ফরজন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিনকেও সাংসারিক জীবনে সজ্জিত দেখতে চাইলেন মনে হয়, যাতে ইত্তেবায়ে রসূল স. এর পরিপূর্ণতায় সুসজ্জিত হতে পারেন হজরত খাজা। হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. এর মাধ্যমে তাই তিনি স. স্বপ্নযোগে সৈয়দ আজহোদ্দিন মাশহাদীকে র. এর নিকট শুভ সংবাদ প্রেরণ করলেন।

স্বপ্নে এরশাদ করলেন হজরত জাফর সাদেক র., তোমার কন্যা বিবি আসমাতুল্লাকে মইনুদ্দিনের সঙ্গে বিবাহ দাও। এ হচ্ছে রসূলে করীম স. এর নির্দেশ।

সৈয়দ আজহোদ্দিন মাশহাদী ছিলেন হজরত খাজা চিশতী র. এর মুরিদগণের দলভুক্ত একজন উচ্চস্তরের আউলিয়া। তাঁর কন্যা বিবি আসমাতুল্লাহও ছিলেন পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এক সুন্দরী রমণী। স্বপ্নের কথা হজরত খাজার সমীপে উত্থাপিত হলে হজরত খাজা বললেন, বিবাহের বয়স তো পার হয়ে এসেছি অনেক কাল আগে। তবু সরওয়ারে দোজাহাঁ স. এর আদেশ অবনত মস্তকে কবুল করলাম আমি।

ঐ দিন রাত্রে জনাবে রসূলুল্লাহ্ স. স্বপ্নে আর্বিভূত হয়ে হজরত খাজাকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতও এই বিবাহে সন্তুষ্ট আছেন।

যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো।

ঐ বৎসর আরো একটি বিবাহ করতে হলো হজরত খাজাকে। এ বিবাহের পিছনেও রয়েছে আল্লাহ্পাকের অদৃশ্য ইশারা।

পাটালী দুর্গাধিপতি ছিলেন মালিক খাত্তাব। হজরত গরীবে নেওয়াজ র. এর নিষ্ঠাবান মুরিদ ছিলেন তিনি। এক রাজপুত সামন্ত রাজার সঙ্গে একবার যুদ্ধ করতে হয়েছিলো তাঁকে। যুদ্ধে পরাজিত রাজার বহু ধনসম্পদের সঙ্গে রাজকন্যাও তাঁর অধিকারে আসে। তিনি রাজকন্যাকে নিয়ে হজরত খাজার দরবারে হাজির হলে রাজকন্যা হজরতের মহানুভবতায় এবং ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেন।

রসূলে করিম স. পুনরায় স্বপ্নের মাধ্যমে জানান, 'প্রিয় মইনুদ্দিন। তুমি আমার দ্বীনের সাহায্যকারী। তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ করে আমার সুন্নতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।'

নির্দেশ পালন করলেন তিনি।

শুরু হলো হজরত খাজার সুন্নতে রসুল স. এর আদর্শে সমুজ্জ্বল সাংসারিক জীবন। তাঁর ফেরেশতাতুল্য জীবন উন্নীত হলো মানবিক মহিমায়।

আল্লাহ্পাক নেক সন্তানসন্ততি দ্বারা পুরস্কৃত করলেন হজরত খাজাকে। পুণ্যময়ী স্ত্রী বিবি আসমাতুল্লাহর গর্ভে জন্ম নিলেন হজরতের তিন পুত্ররত্ন। খাজা ফখরুদ্দিন আবুল খায়ের র., খাজা জিয়াউদ্দিন আবু ছাইদ র. এবং খাজা হোছামুদ্দিন আবু ছালেহ্ র.।

দ্বিতীয় স্ত্রী পুণ্যবতী আমাতুল্লাহ। ইসলাম গ্রহণের পর এই নামে অভিহিত হতেন তিনি। আল্লাহ্পাক তাঁর কোলও আলোকিত করে দিলেন। হজরত খাজার একমাত্র কন্যা সৈয়দা বিবি হাফেজা জামাল র.কে লাভ করে ধন্য হলেন বিবি আমাতুল্লাহ।

কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটে। এবাদত বন্দেগীতে সময় অতিবাহিত হয় অনেক। তার উপর পালন করতে হয় বিশাল জামাতের শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। দ্বীন প্রচারক প্রতিনিধিবৃন্দকে দিতে হয় বিভিন্ন আদেশ নির্দেশ। দিতে হয় খাস তাওয়াজ্জোহ। দেখাশোনা করতে হয় দূর দূরান্ত থেকে আগত নও মুসলিমদের। এর উপরে রয়েছে স্ত্রী সন্তান সন্ততিদের হক প্রতিপালন।

সাংসারিক শৃংখলায় ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন হজরত। দীর্ঘ দিন পথে প্রবাসে পরিভ্রমণরত বিহঙ্গ মন এবার নীড় বেঁধেছে যেনো।

সংসার কঠিন স্থান। নিশ্চয়ই কঠিন স্থান। কিন্তু তবু আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা, সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েই মানুষ দ্বীনের পথে কায়েম থাকুক। তাই তিনি তাঁর হাবীব মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. কে সজ্জিত করেছেন সংসারীর সাজে। আর নিশ্চয়ই মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. এর আদর্শই উত্তম আদর্শ। এতে দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব পালনের মর্যাদাও আছে। ফেরেশতাগণ এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। সুন্নতে রসূল স. এর অনুসরণের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল সাংসারিক জীবন, ফেরেশতাদের নির্ঝঞ্ঝাট নিষ্পাপ জীবনের চেয়েও অনেক বেশী সম্মানিত।

একদিন হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. তাঁর প্রিয় খলিফা হজরত হামিদুদ্দিন নাগোরীকে প্রশ্ন করলেন, 'হামিদ। বলতে পারো, আমি যখন শক্ত সামর্থ্য যৌবনকাল অতিবাহিত করেছি, তখন আমার যা কিছু প্রয়োজন ছিলো, তা বিনা প্রার্থনায় লাভ করেছি। আর এখন আমার বার্ধক্য বয়স। এখন আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানাতে হয় কেনো?

হজরত হামিদুদ্দিন নাগোরী জাবাব দিলেন, 'হজরত। আপনিতো অবগত আছেন, হজরত ইসা আ. এর পুণ্যময়ী মাতা হজরত মরিয়ম বিনা প্রার্থনায় বিভিন্ন প্রকার ফলমূল লাভ করতেন। তারপর যখন হজরত ঈসা আ. এসে তাঁর কোল আলোকিত করলেন, তখন তাঁকে তাঁর আহার্যের জন্য প্রার্থনা জানাতে হলো বারেগাহে এলাহীর দরবারে। আল্লাহ্ বারীতায়ালা নির্দেশ দিলেন– 'খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়া দাও, তাহলে তোমার জন্য পরিপক্ক সুমিষ্ট খেজুর পড়তে থাকবে'। আপনার অবস্থাতো হজরত মরিয়ম আ. এর মতোই। এখনকার অবস্থা তো পূর্ব অবস্থা থেকে উন্নততর।

জবাব শুনে সন্তুষ্ট হলেন হজরত গরীবে নেওয়াজ র.।

আজমীরের নিকটবর্তী মান্দর গ্রামের কিছু কৃষিভূমি হজরত খাজাকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। হজরতের পুত্রগণ ঐ জমিতে কৃষিকাজ করতেন। ঐ জমির ফসল দিয়েই হজরত খাজার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেতো।

সেবার ফসলের মওসুমে ঘটলো এক বিপদ। অন্যায়ভাবে ফসলসহ সমস্ত জমি স্থানীয় হাকিম বাজেয়াপ্ত করলেন। জায়গীর প্রদানের লিখিত সনদপত্র না থাকাতেই হাকিম বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারী করেছিলেন।

পুত্রদের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে হজরত খাজা বিস্মিত হলেন। কিন্তু কি আর করা। আইনতো মানতেই হয়। আইনতো সবার জন্য একই রকম হওয়া উচিত।

দিল্লীর সম্রাট তখন শামসুদ্দিন আলতামাশ। কুতুবুদ্দিন আইবেকের পরে তিনি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেছেন। বাদশাহ আলতামাশ ছিলেন কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. এর একনিষ্ঠ মুরিদ।

হজরত খাজা তাঁর খলিফা কুতুবুদ্দিন কাকী অথবা সরাসরি বাদশাহকে পত্র লিখে ব্যাপারটা জানালে সমস্যার তাৎক্ষণিক সুরাহা হয়ে যেতো। কিন্তু হজরত খাজা তা করলেন না। নিজেই সশরীরে রওয়ানা হয়ে গেলেন দিল্লী অভিমুখে। হয়তো ভাবলেন, সংসারী মানুষকে নিজ সমস্যা নিজ হাতে সমাধান করতে হয়। তিনিও তো সংসারী মানুষ। সুতরাং সাংসারিক নিয়ম তাঁরও মেনে চলা উচিত।

বিনা সংবাদে দিল্লী এসে উপস্থিত হলেন হজরত খাজা। কিন্তু সংবাদ চাপা রইলো না কারো কাছে। লোকমুখে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। হজরত কুতুবুদ্দিন কাকী, বাদশাহ আলতামাশ এবং ভক্ত দিল্লীবাসীদের বিরাট কাফেলা অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হলো। সালাম ও সমাদরের সঙ্গে সবাই হজরত খাজাকে নিয়ে এলেন দিল্লীতে।

কুতুবুদ্দিন কাকী কিন্তু ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিনা সংবাদে এভাবে হজরতের আগমনের হেতু বুঝতে পারলেন না তিনি। আরজ করলেন, হজরত। দিল্লীর মাটি ও মানুষের কতইনা সৌভাগ্য। আপনার কদম চুম্বনের সুযোগ লাভ করেছে সবাই। তবু এই বৃদ্ধ বয়সে এতো কষ্ট করে দিল্লী সফর করলেন কেনো, তার কারণ জানতে ইচ্ছা করি।

কারণ বর্ণনা করলেন হজরত খাজা। হজরত কুতুবুদ্দিন আরজ করলেন, 'এ অধম আপনার গোলাম। বাদশাহ্ আলতামাশ আপনার গোলামের গোলাম। আপনি পত্র মারফত নির্দেশ দিলেই তো আপনার কাজ সম্পন্ন করে কৃতার্থ হতাম আমরা।

বাদশাহ্ আলতামাশ যথাযোগ্যসম্মান প্রদর্শন করলেন হজরতের প্রতি। ধন্য হলেন তিনি। সসম্মানে জায়গীর সম্পর্কিত লিখিত সনদ প্রদান করলেন তৎক্ষণাৎ।

কয়েকদিন দিল্লীতে অবস্থান করলেন হজরত গরীবে নেওয়াজ। সারাক্ষণ লেগে থাকে জনতার ভীড়। বাদশাহ্ নিজেও নিয়মিত দুইবেলা হাজির হন হজরতের খেদমতে।

হজরত একদিন কুতুবুদ্দিন কাকীকে বললেন, বাবা কুতুব। তোমার খাস মুরিদানের মধ্যে কেউ কি আমার সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত আছে?

হজরত কাকী জানালেন, 'হাঁ। মাসউদ নামে এক যুবক তার হুজরায় কঠোর মোজাহেদায় নিমগ্ন হয়ে আছে। তাই আপনার খেদমতে সে হাজির হতে পারেনি।

হজরত কাকী সেই যুবকের প্রশংসা করলেন খুব। তারপর হজরত খাজাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন যুবক মাসউদের হুজরাখানায়।

মাসউদ। পুরো নাম হজরত খাজা ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর র.। উপর্যুপরি দীর্ঘদিনের কঠোর মোজাহেদার ফলে শারীরিক শক্তি তাঁর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো প্রায়। সামনে নিজ পীর ও দাদাপীরকে দেখা সত্তেও সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হলেন না তিনি। শুধু কাঁদতে লাগলেন অঝোর নয়নে।

হজরত খাজা দেখেই বুঝতে পারলেন, এই যুবক কালে চিশতীয়া খান্দানের এক বিশাল মহীরুহ হিসাবে তার রূহানীয়াতের শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করবে সারা হিন্দুস্তানে। লাভ করবে চিশ্তী চেরাগের পরবর্তী উত্তরাধিকার।

হজরত এরশাদ করলেন, বাবা কুতুব। তুমিতো এক বিরাট সাধক– শার্দুলকে খাঁচায় আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছো। এই যুবক একসময় আমার রূহানী খান্দানকে উজ্জ্বলিত করবে শতশিখায়। নক্ষত্রের মতো দরবেশদের সভায় তার অবস্থান হবে তেজদীপ্ত সূর্যের মতো। কঠিন মোজাহেদার আগুনে তুমি তো একে ভস্মীভূত করে দিয়েছো। এখন তাঁকে নেয়ামত দান করো।

হজরত কাকী আরজ করলেন, হজরত আমি তো আপনার গোলাম। প্রভুর সামনে অন্যকে কিছু দান করার কী ক্ষমতা থাকতে পারে গোলামের?

হজরত খাজা পুনরায় এরশাদ করলেন, 'হাজার হলেও ফরিদউদ্দিন মাসউদ তোমারই মুরিদ। এসো তার এক পাশে তুমি আর অন্য পাশে আমি দাঁড়াই এবং বিশেষ ভাবে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করি তাঁকে।

আরো একবার দিল্লী আসতে হলো হজরতকে। আসতে হলো খেদমতে খালকের হক আদায় করবার জন্য।

একবার একজন দরিদ্র কৃষক এসে নিবেদন জানালো, হজরত। এখানকার বিচারক আমার জমিজমা এবং ফসল বাজেয়াপ্ত করেছে। বাদশাহর আদেশনামা না পেলে আমি আর জমি ও ফসল ফেরত পাবো না। গরীব মানুষ আমি। কৃষি কাজই আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। আপনি অনুগ্রহ করে বাদশাহর নিকট আমার পক্ষে সুপারিশের জন্য যদি হজরত কুতুব সাহেবকে একখানা পত্র লিখে দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই।

হজরত বললেন, হাঁ চিঠি লিখে দিলে তোমার কার্যোদ্ধার হবে আশা রাখি। কিন্তু তা না করে আমি নিজেই যেতে চাই তোমার সুপারিশের জন্য।

তাই করলেন হজরত। কৃষককে নিয়ে দিল্লী এসে হাজির হলেন তিনি। পূর্ব সংবাদ দিয়ে কোনো স্থানে যাওয়া বরাবরই পছন্দ ছিলো না হজরত খাজার। এবারও তাই করলেন তিনি।

দিল্লীর কাছাকাছি পৌছলে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো হজরতের আগমন সংবাদ।

ছুটে এলেন প্রিয় খলিফা কুতুবুদ্দিন কাকী। ছুটে এলেন সুলতান আলতামাশ। ছুটে এলো দিল্লীর আপামর জনতা। হজরতের কদম চুম্বন করে ধন্য হলো সবাই। বিপুল সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে হজরতকে শহরে নিয়ে এলেন ভক্তবৃন্দ।

এবারও উৎকণ্ঠিত হলেন হজরত কুতুবুদ্দিন কাকী। কিন্তু পরে যখন হজরতের আগমনের হেতু জানলেন, তখন অনুযোগ করলেন হজরত কুতুবুদ্দিন কাকী, 'হজরত। আপনার কোনো ভৃত্যও যদি বাদশাহকে আপনার এরশাদ জানিয়ে দিতো, তবে বাদশাহর কি সাধ্য ছিলো আপনার নির্দেশের অন্যথা করে। অথচ এই শরীর নিয়ে আপনি এতো কষ্টকর সফর এখতেয়ার করলেন।'

হজরত খাজা বললেন, 'জানো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা শ্রেষ্ঠ এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হয়। এই গরীব চাষী যখন আমার কাছে এসেছিলো, তখন তার মুখ ছিলো কতো মলিন। আমি দিল্লী রওয়ানা দিতেই দেখলাম, তার মুখ ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। তার প্রফুল্ল বদন দেখে কতো খুশী হয়েছি আমি। আজমীরে বসে থাকলে কি আমি তার উৎফুল্ল মুখ দেখবার সুযোগ পেতাম?

জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে উপনীত হলেন হজরত খাজা। লক্ষ কোটি কৃতজ্ঞতা বারে গাহে এলাহীর দরবারে। তিনি তাঁর জীন্দেগী সাধনাসমৃদ্ধ করেছেন। সাধনা সফল করেছেন। বৃত হয়েছেন তিনি বিশাল এক পৌত্তলিক ভূখণ্ডে দ্বীন ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। আল্লাহ্পাক তাঁর মাধ্যমে বিশাল হিন্দুস্থানের আশি লক্ষ মানুষের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করেছেন চিশ্তী চেরাগের চিরঅম্লান নূর। শোকর লক্ষ কোটি শোকর সুজুদ। লক্ষ কোটি সুজুদ। সফলতা। চতুস্পার্শ্বে শুধু সফলতারই সয়লাব।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'জেনে রাখো। আল্লাহ্পাকের আউলিয়াগণ কখনো ভীত ও চিন্তিত হন না। না দুনিয়ায়, না আখেরাতে।'

তাঁরাই সত্যিকার অর্থে নায়েবে নবী স.। তাঁদের অনুসরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ প্রাপ্তির কোনো পথ খোলা নেই। দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে আউলিয়া জামাতকে অস্বীকার করে। তাদের সোহবতের ফায়দা গ্রহণ থেকে মাহরূম হয়। বদবখত্ ঐ সম্প্রদায়, যারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার অলির বিরুদ্ধাচরণ করে, সে যেনো আমার বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য তৈরী হয়।' অথচ শত সহস্র আফসোস। ইসলামী আন্দোলন, একামতে দ্বীন, এরকম আপাতমধুর শ্লোগানে ময়দান মাতকারী মুসলমান নামধারী এক ফেৎনাবাজ জামাত মোনাফেকদের মতো সুকৌশলে আউলিয়া সম্প্রদায়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নিশ্চিহ্ন করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এরা প্রকারান্তরে আল্লাহ্পাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আল্লাহ্পাক তাঁর দুশমনদের অবশ্যই শায়েস্তা করতে সক্ষম।

হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী আজমেরী র. সাধারণ মর্যাদার আউলিয়া নন, আউলিয়াসম্রাট তিনি। সুলতানুল হিন্দ তিনি। তাই তাঁর স্বভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রসূলেপাক স. এর সমুদয় পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ। রসূলেপাক স. এর মতোই তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে বুৎপরোস্তি, জুলুম ও অবিশ্বাস।

বিজয় লাভের পূর্বশর্ত হৃদয়বল। আল্লাহ্প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যেই থাকে প্রকৃত মানব প্রেম– সত্যিকার মানবতা। জেহাদের ময়দানের অস্ত্রবল তো এই হৃদয়শক্তিরই অনুসরণ করে মাত্র। যাদের হৃদয়ে এই জ্যোতির্ময় অধ্যায় সংযোজিত হয়নি, তাদের মুখে জেহাদ শব্দ উচ্চারিত হওয়া অন্যায়। তাদের হাতের অস্ত্র ফেৎনা ফাসাদ ও অশান্তির পথ নির্মাণে সহায়তা করে মাত্র। যারা নিজেরাই অন্যায় অবস্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠ, তারা কীভাবে করতে পারে অন্যায়ের প্রতিরোধ?

আল্লাহ্ প্রেমে পরিপূর্ণ এই চির বিজয়ী ঐশী শক্তি হজরত রসূলুল্লাহ স. লাভ করেছিলেন হেরা গুহায়। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রা. এই আত্মিক শক্তি (রূহানীয়াত) লাভ করেছিলেন রসূলে করিম স. এর মোবারক সোহবত থেকে বায়াতের বন্ধনের মাধ্যমে। এই বায়াতের বন্ধনের সিঁড়িপথ বেয়ে এভাবেই সোহবত ও খেদমতের মাধ্যমে জারী হয়েছে রূহানিয়াত প্রশিক্ষণের অনুসরণীয় পদ্ধতি– যার নাম হয়েছে তরিকা। পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে যা শত শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীর কোণায় কোণায়। এই পদ্ধতি অনুসরণে যারা গড়িমসি করে, তারা পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীনের অন্তর্ঘাতী দুশমন। আল্লাহ্পাক তাদেরকে হেদায়েত করুন। হেদায়েতের উপযোগী না হলে ধ্বংস করুন।

কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে আসে ক্রমে ক্রমে। হজরত খাজার উত্তরোত্তর ভাবান্তর হয়। দীর্ঘ এক শতাব্দীকালের বিশাল পরিধির সীমানায় সঞ্চিত হয়ে আছে কতো সুখ দুঃখের স্মৃতি। কতো প্রেমোন্মত্ততা, কতো দুরূহ সাধনার ক্লেশকর অধ্যায়।

কতো বিচিত্র মানুষ। কতো বিচিত্র মানুষের মুকুলিত মনোভূমি। সব অস্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

কোথায় জন্মভূমি সঞ্জর। কোথায় বোখারা সমরখন্দ বাগদাদ। কোথায় বায়তুল্লাহ। কোথায় রওজায়ে নববী স.। কোথায় পীর ও মোর্শেদ। কোথায় প্রাণের দোসর, প্রাণের দ্যুতিদগ্ধ বিপরীত পৃষ্ঠা– হজরত ওসমান হারূনী চিশতী র.। ফেলে আসা জীবনের বিচিত্র জগত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে আসছে যেনো।

আজ লক্ষ লক্ষ জনতার বুকে চিশ্তী প্রদীপের আলোর ঝলক। তাঁর অমূল্য বাণী আজ ফিরছে কতো স্থানের লোকের মুখে মুখে। শ্রদ্ধাভরে হজরতের অমূল্য বাণী আজো উচ্চারিত হয় অগণিত আশেকের কণ্ঠে।

হজরত বলেন, 'কোনো মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞানে উৎপীড়নে যে ক্ষতি হয়, অন্য কোনো পাপ কাজে মানুষের সেই পরিমাণ ক্ষতি হয় না।'

'কেয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে মুক্তিকামীদের উচিত, তারা যেনো বিপন্ন, দুস্থ ও অত্যাচারিতদের খেদমত করতে থাকে, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করে এবং ক্ষুধার্তকে আহার প্রদান করে।

'দানশীলতা নেয়ামত লাভের চাবি।'

'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজান্তে আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকে– ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে।'

'তিনিই প্রকৃত আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয় লাভকারী) যিনি কোনো অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরান না।'

'সোহবতের (সংস্রবের) প্রভাব অবশ্যই হয়। নেককার ব্যক্তিগণের সোহবত নেক কর্ম থেকে উত্তম। পক্ষান্তরে পাপকর্ম থেকে পাপী ব্যক্তির সোহবত অধিকতর মন্দ।'

'আল্লাহ্পাক যাদেরকে প্রেমের রশি দিয়ে বেঁধেছেন, তাদের মাথার উপরে তিনি বারিধারার মতো বিপদ বর্ষণ করেন।'

'পৃথিবীতে প্রত্যেক জামানায় হাজার হাজার অলিআল্লাহ বিদ্যমান থাকেন। তাদের অনেকেই থেকে যান মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। সুতরাং পৃথিবীকে কখনোও আউলিয়া শূন্য মনে করো না।'

'সর্বাবস্থায় বদনে প্রশান্তি এবং হাসির আভা বিদ্যমান থাকা আরেফ ব্যক্তিদের অন্যতম লক্ষণ।'

'আরেফের মস্তকে বিরামহীনভাবে নূর বর্ষিত হয়।'

'নীরবতা আরেফের স্বভাব।'

'আরেফ ঐ ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয়কে দুনিয়া ও আখেরাত– উভয়ের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্পাকের হাজার হাজার তাজাল্লি তার উপর বিকশিত হয়।'

'আমি মইনুদ্দিন চিশ্তী প্রতি নিঃশ্বাসে ইশক এবং আছরারে এলাহীর সত্তর হাজার সমুদ্র পান করছি। তবুও আমি তৃষিত। সেই সাগরের একবিন্দু পানি পান করেই মনসুর হাল্লাজ র. 'আনাল হক' বলে ফেলেছিলেন।'

'গভীর ভক্তি ভরা হৃদয় সহযোগে পীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তার খেদমত করা শ্রেষ্ঠ এবাদত।'

'মহাপ্রস্থানের পথের বোঝা হাল্কা করে নাও। কারণ, মৃত্যুরূপী ঝুলন্ত শৃঙ্খলটি যে কোনো মুহূর্তে তোমার স্কন্ধ বেষ্টন করে নিতে পারে।'

'অলি আল্লাহ্গণ নূরময়। তাঁরা সূর্যের মতো নিজ নূর দ্বারা জগতকে জ্যোতির্ময় করে রাখেন।'

'সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্পাকের প্রকৃত প্রেমিক, যে দুনিয়া আখেরাতের সবকিছু আল্লাহ্র জন্য কোরবানী করেও মনে করেন, কিছুই করা হয়নি।'

'দুনিয়াতে তিনটি বস্তু অত্যন্ত দুর্লভ। এক, অলি আল্লাহ্গণের সৎ নসিহত। দুই, দুনিয়ার ভোগলালসার প্রতি নিরাসক্তি। তিন, সর্বক্ষণ আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকা।'

আমার পীর কেবলা এরশাদ করেছেন, মোমেন ব্যক্তি ফকিরিকে এবং রোগ ব্যাধি ও মৃত্যুকে বন্ধু বলে জানেন। যে ব্যক্তি এই তিনটি বস্তুকে প্রিয় জানবে, আল্লাহ্পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁকে বন্ধু জানবেন এবং এর বিনিময়ে সে বেহেশত লাভ করবে।'

'তারাই প্রকৃত প্রেমিক, যাদের হৃদয় প্রতি মুহূর্ত জিকিরে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যায় না।'

'মানুষের জন্য ঐ সময়টি সর্বোত্তম, যখন অন্তর ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) মুক্ত থাকে।'

'মিথ্যা কসমকারীদের নিকট থেকে খায়ের ও বরকত বিদায় নেয়। মিথ্যা কসমকারী নিজের বাড়ীঘর ও ধনসম্পত্তিকে বরকত থেকে বঞ্চিত করে। পক্ষান্তরে, মহৎ লোকেরা সত্য কসম করতেও আতংকিত হন।'

'তিনটি বস্তুর মাধ্যমে ইমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। আল্লাহ্ভীতি, আল্লাহ্ প্রাপ্তির কামনা এবং আল্লাহ্র প্রেম।'

'মোমেনগণ নামাজের মাধ্যমে মেরাজ লাভ করেন। নামাজের প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি আরকান নূরে পরিপূর্ণ। নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহ্তায়ালার মিলন লাভ হয়। নামাজ একটি নিগুঢ় রহস্যের বস্তু।'

'ইশকে এলাহীর চতুস্পার্শ্বে তাওয়াফ করবার জন্যই মানব হৃদয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

'মৃত্যু আগমনের আগে তওবা করো এবং নামাজের সময় অতিবাহিত হবার আগেই নামাজ আদায় করো।'

'প্রেমিকগণের জন্য মৃত্যু সেতু স্বরূপ। ঐ সেতুর মাধ্যমেই আশেক মাশুকের মিলন হয়।'

'অলি আল্লাহ্গণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহব্বত রাখা এবং তাঁদের সম্মান করা একান্ত আবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম।'

'আমার পীরগণের তরিকার ভিত্তি ইশকে এলাহী (আল্লাহ্প্রেম)।'

'আহলে সুলুক (তরিকতপন্থি)দের জন্য পাঁচটি জিনিস দেখা এবাদত হিসাবে গণ্য। এক মাতাপিতাকে দেখা। দুই কোরআন শরীফ দেখা। তিন, আলেমে রব্বানীকে দেখা। চার বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা। পাঁচ নিজের পীর মোর্শেদকে দেখা। আমার পীর ইমামুল আউলিয়া শায়েখুল ইসলাম হজরত ওসমান হারূনী র. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তম ধারণা এবং অন্তরের মহব্বতের সঙ্গে নিজ মোর্শেদের খেদমত করবে, আল্লাহ্পাক তাকে বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখেল করবেন এবং হাজার বৎসরের এবাদতের ছোয়াব তাঁকে দান করবেন। পীরের নসিহত একান্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনা এবং তা নির্বিবাদে পালন করা মুরিদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। পীরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর মোবারক চেহারা দর্শনের জন্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা থাকা চাই। আল্লাহ্পাকের দরবার থেকে যিনি যে নেয়ামত লাভ করুন না কেন, তা পীরের খেদমত ও সন্তুষ্টির অসিলাতেই লাভ করেন।'

'আমি তো আমার পীর হজরত খাজা ওসমান হারূনীর গোলামী এখতেয়ার করার পর একাধারে বহুবৎসর যাবত দিন রাত তাঁর খেদমতে কাটিয়েছি। তিনি যখন সফর করতেন, আমি তাঁর বিছানা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে চলতাম। তাঁর আদেশ সীমাহীন উৎসাহ, প্রেম ও বিশ্বাসের সঙ্গে পালন করতাম। তিনি আমার খেদমতে সন্তুষ্ট হয়ে এমন নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, যা বর্ণনাযোগ্য নয়। পীর মুরিদকে আমল ও অজিফায় যে নির্দেশ প্রদান করেন, তা জীবন অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করে যদি মুরিদ পালন করতে পারে, তবেই মুরিদের পক্ষে মঞ্জিলে মকছুদে উপনীত হওয়া সম্ভব।'

আমার ভাই শায়েখ শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি র. আরাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে দিন রাত নিজ পীরের খেদমত করেছিলেন। তিনি সফরের সময় তাঁর পীরের

বিছানা পত্র মাথায় নিয়ে চলতেন। এরূপ খেদমতের অসিলায় তিনি আউলিয়াগণের ইমাম হবার মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।'

হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. এর নিকট আউলিয়া প্রসঙ্গ ছিলো অত্যন্ত প্রিয়। তিনি নিজে মহামর্যাদাসম্পন্ন আউলিয়া ছিলেন বলেই আউলিয়া সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও মহত্ব সম্পর্কে ছিলেন আবেগপ্রবণ।

সুযোগ পেলেই বিভিন্ন আউলিয়া প্রসঙ্গ অবতারণা করে তিনি মানুষকে প্রদান করতেন অমূল্য উপদেশ।

হজরত হাসান বসরী র. এর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি এভাবে−

হজরত হাসান বসরী র. একবার এক কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কয়েকজন লোক সেখানে আমোদ প্রমোদের সঙ্গে পানাহারে লিপ্ত আছে। হজরত হাসান বসরী তাঁদের নিকট গেলেন। বললেন, 'তোমরা মুসলমান না মোনাফেক? তোমরা কি রসূলুল্লাহ স. এর এরশাদ সম্পর্কে অবগত নও? তিনি স. এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কবরস্থানে পানাহার করে, সে মোনাফেক। কবরস্থান উপদেশ গ্রহণের স্থান। এখানে তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম মানুষ শায়িত আছেন। তাদের দেহ মাটিতে মিশে গিয়েছে। অস্থি মজ্জা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তোমরাই তোমাদের এ সমস্ত প্রিয়জনদের নিজ হাতে দাফন করেছো। তারপর ভেবে দেখো, কীভাবে এখানে তোমরা পানাহারে মত্ত হতে পারো?'

হজরতের কথা শুনে লোকগুলি লজ্জিত হলো এবং তওবা করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো।

হজরত ফতেহ্ মোসিলি র. এর একটি ঘটনাও তিনি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন এভাবে−

'খাজা ফতেহ্ মোসিলি র. একজন কামেল অলিআল্লাহ্ ছিলেন। তিনি কবর আজাবের ভয়ে একাধারে আট বৎসর যাবত বিরতিহীনভাবে কেঁদেছিলেন। চেহারায় তাঁর চোখের পানির দাগ পড়ে গিয়েছিলো। তাঁর মুখে কয়েকটি হাড্ডি ছাড়া আর কিছু ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পর একজন বুজর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন তাঁকে। প্রশ্ন করলেন, 'আল্লাহ্‌পাক আপনার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। আমি খুবই ভীত সন্ত্রস্ত

ছিলাম। আমাকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আরশে পৌছানো হয়। সেখানে আমি আল্লাহ্‌পাককে সেজদা করি। তখনও ভয়ে কাঁপছিলাম আমি। আল্লাহ্‌পাক প্রশ্ন করলেন, দুনিয়ায় তুমি এতো কান্নাকাটি করতে কেনো? তুমি কি জানতে না, আমি গাফ্‌ফার (ক্ষমাশীল)? আমি বললাম, 'পরওয়ারদেগার। আমি জানতাম সে কথা। কিন্তু মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং কবরের আজাব আমাকে অশান্ত করে রাখতো। সংকীর্ণ কবরে আমার দশা যে কি হবে, তা ভেবে ভেবে আমি ভীত হয়ে পড়তাম। আল্লাহ্ বললেন, যাও। তোমাকে মাফ করলাম। আজ থেকে তুমি শংকামুক্ত।'

হজরত খাজা আরো বর্ণনা করেছেন, 'আমার ওস্তাদ হজরত মওলানা শরফুদ্দিন র. এর লেখা এক পুস্তকে আমি দেখেছি, খাজা শিবলী র. কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হজরত। আপনি এতো এবাদত করেন, অথচ আপনি দেখি সারাক্ষণ ভীত সন্ত্রস্তও থাকেন। এর কারণ বুঝতে পারি না। আল্লাহ্‌পাক তো আপনাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন।

হজরত শিবলী জবাব দেন, আমার শংকিত হবার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমি আশংকা করি, না জানি আল্লাহ্‌পাক আমাকে কখন বলে বসেন, 'তুমি ক্ষমার উপযুক্ত নও। দ্বিতীয়ত, ইমান সহযোগে আমি দুনিয়া পরিত্যাগ করতে পারবো কি না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।'

'জামেউল হেকায়াত' কেতাবের বরাত দিয়ে হজরত খাজা আরো বর্ণনা করেছেন, 'এক দুষ্ট লোক সব সময় পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো। মানুষ তার সংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হয়নি। জীবনভর সে পাপের মধ্যেই নিমজ্জিত ছিলো। তার মৃত্যুর পর এক বুজর্গ স্বপ্নে তার সাক্ষাত লাভ করলেন। দেখলেন, তার শরীরে মূল্যবান পরিচ্ছদ। মাথায় সুন্দর টুপি। অপূর্ব বেশে সে ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করছে। বুজুর্গ ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, দুনিয়াতে তো তুমি পাপিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলে। এরূপ মর্যাদা লাভ করলে কীভাবে? সে জবাব দিলো, 'আল্লাহ্‌পাক কার কোন্ আমল কিভাবে কবুল করেন, তা কারো বুঝবার সাধ্য নেই। জীবন ভর আমি তো শুধু পাপই করেছি। নাজাতের কোনোই আশা ছিলো না আমার। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক শুধুমাত্র একটি কারণে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন− যখনই কোরআন শরীফ আমার দৃষ্টিগোচর হতো, তখনই তার সম্মানের জন্য আমি দাঁড়িয়ে যেতাম এবং শ্রদ্ধাবনতভাবে কোরআন শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এটাই ছিলো আমার সারা জীবনের একমাত্র নেক আমল। এই একটি আমলের কারণেই আল্লাহ্‌পাক আমার সারাজীবনের গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।'

হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী আজমীরী র. ইশকে এলাহী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন এক অনন্য ঘটনা। বলেছেন, তিনি–

একবার এক মজলিশে উপস্থিত ছিলেন হজরত হাসান বসরী র., হজরত রাবেয়া বসরী র., হজরত মালেক ইবনে দীনার র. এবং হজরত শকীক বলখী র.। মজলিশের স্থান ছিলো বসরা নগরী। খাঁটি মহব্বত সম্পর্কে আলোচনা চলছিলো আউলিয়া চতুষ্টয়ের মধ্যে। হজরত হাসান বসরী র. বললেন, সেই ব্যক্তিই খাঁটি প্রেমিক, যিনি দুঃখ ও বিপদে পড়লেও ধৈর্যধারণ করেন।

এই কথা শুনে হজরত রাবেয়া বসরী র. বললেন, 'হে খাজা, আপনার বক্তব্য অহংকারের গন্ধমুক্ত নয়।'

হজরত মালেক ইবনে দীনার বললেন, 'সকল প্রকার দুঃখ কষ্টে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকে, সেই ব্যক্তিই খাঁটি মহব্বতের অধিকারী।

হজরত রাবেয়া বসরী র. বললেন, 'প্রকৃত প্রেমিকের সংজ্ঞা এর চেয়েও উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

খাজা শকীক বলখী র. বললেন, 'সত্যিকারের আল্লাহ্‌ প্রেমিক তো সেই খোশনসিব ব্যক্তি, 'যাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও 'উহ্‌' শব্দ যার মুখে উচ্চারিত হয় না'।

হজরত রাবেয়া বসরী র. এবারেও বললেন, 'প্রেমিক ব্যক্তির কাছে দুঃখ বিপদ হাজির হলে দীদারে এলাহীর আবেশে তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্টকে লক্ষ্য বস্তুর বাহিরে ফেলে রাখেন।'

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হজরত খাজা আজমিরী র. বললেন, 'আমারও বক্তব্য এরকম।'

এলো বিদায়ের দিন। কাজ শেষ। এখন মাশুক মিলনের মধুর লগ্ন। দীদারে এলাহীর যবনিকা উন্মোচিত হয় হয় প্রায়। আলহামদুলিল্লাহ্‌। এবার হবে দীর্ঘ বিরহের মধুময় পরিসমাপ্তি।

শেষ মজলিশ বসলো আজমীরের জামে মসজিদে। বৃহস্পতিবারে। হজরত খাজা গরীবে নেওয়াজকে ঘিরে বসেছিলেন কয়েকজন দরবেশ, আত্মীয় স্বজন এবং বিশিষ্ট কিছু মুরিদান। আলোচনা চলছিলো হজরত আজরাইল আ. সম্পর্কে। হজরত খাজা বললেন, 'মালেকুল মউত না হলে এই পৃথিবীর মূল্য একটি যবের বীজের সমানও হতো না।'

প্রশ্ন উত্থিত হলো, 'সে কিরূপ?

তিনি এরশাদ করলেন, 'হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু সেতুতুল্য। এই সেতুর সাহায্যেই বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়।'

এরপর আবারও তাঁর মোবারক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, 'তিনি সত্যিকারের বন্ধু, যিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বন্ধুর স্মরণ করেন। কারণ, অন্তর বন্ধুর স্মরণের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে আরশের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করাই অন্তরের কর্তব্যকর্ম। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যখন আমার স্মরণ তোমার উপর প্রবল হয়ে পড়বে, তখন আমি তোমার আশেক হয়ে যাবো।

বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে হজরত পুনরায় এরশাদ করলেন, 'এখানে আমার সমাধি হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাকে এখানে আনা হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে আমাকে শেষ সফর সম্পন্ন করতে হবে।'

মজলিশে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বুজুর্গ শায়েখ আলী সানজারী র.। তাঁকে উদ্দেশ্য করে হজরত চিশতী র. বললেন, নিদর্শন লিপিবদ্ধ করো। এই নিদর্শন কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে দিও। তারপর বলে দিও, সে যেনো দিল্লী চলে যায়। আমি তাকে খেলাফত প্রদান করলাম।

হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন হজরতের এরশাদ। কয়েকদিন আগেই আজমীরে হাজির করা হয়েছে তাঁকে।

নিদর্শন প্রস্তুত হবার পর তা হস্তান্তর করা হলো। হজরত কাকী আদবের সঙ্গে গ্রহণ করলেন খেলাফতের মোবারক নিদর্শন।

হজরত খাজা কাছে ডাকলেন তাঁর প্রাণ প্রিয় রূহানী ফরজন্দ, তরিকার উত্তরাধিকারী হজরত বখতিয়ার কাকীকে। তারপর হজরত ওসমান হারূনী যে টুপি ও পাগড়ী তাঁকে দিয়েছিলেন, সেই টুপি ও পাগড়ী তিনি পরিয়ে দিলেন হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাথায়। এ ছাড়া এক জেলদ কোরআন শরীফ এবং একটি নামাজের মুসাল্লাও দান করলেন তাঁকে।

বললেন, রসূলে করিম স. এর নিকট থেকে এই আমানত আমাদের চিশতীয়া তরিকার পীরানে কেরামের মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছিলো। এ সমস্ত পবিত্র সামগ্রী। আমার অন্তিম সময়। এখন তুমিই এই আমানতের অধিকারী। এই

আমানতের হক আদায় করো। চিশতীয়া তরিকার পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নিকট এই আমানত যথাযথভাবে পৌছে দিও। দেখো, কেয়ামতের দিন আমানতের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে যেনো তরিকার ঊর্ধ্বতন পীরানে কেরামদের সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

হজরত খাজার একনিষ্ঠ গোলাম হজরত কাকী প্রিয় মোর্শেদের এরশাদ অনুযায়ী দিল্লী প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

উপবিষ্ট অবস্থা থেকে উঠলেন হজরত গরীব নেওয়াজ র.। তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজের পর দোয়া করলেন অনেকক্ষণ। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'যাও। তোমাকে আমি আল্লাহ্পাকের হাওয়ালা করলাম। তোমাকে আমি সম্মানিত স্তরে পৌছে দিলাম।'

হজরত খাজা আবার বললেন, চারটি বস্তু মহামূল্যবান। এক, সেই দরিদ্র, যিনি নিজেকে ধনবান বলে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাকে দেখে যেনো অভাবী মনে না হয়। দুই, সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, যিনি নিজেকে তৃপ্ত হিসাবে জাহির করেন। অর্থাৎ ক্ষুধার কথা প্রকাশ করা এবং অভিযোগ করা যার স্বভাব নয়। বরং ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা যার স্বভাবে পরিণত হয়। তিন, সেই চিন্তিত ও বিপন্ন ব্যক্তি, যিনি থাকেন প্রফুল্লচিত্ত। বিপদের কারণে অধীর হওয়া যার স্বভাব বিরুদ্ধ। চার, সেই ব্যক্তি, যিনি শত্রুর সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহারে অভ্যস্থ।'

এরপর হজরত আবার এরশাদ করলেন, 'প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়ের মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি গভীর রাতের গোপন নামাজ সম্পন্ন করেছো কি? উত্তরে সে বলে, আমার অবসর কই? আমি তো মুহুর্মুহু মালাকুল মউতের আশে পাশে পরিভ্রমণ করছি। যেখানেই সে যায়, সেখানেই আমি তাকে পাকড়াও করি।

হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী র. কদমবুছি করবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হজরত খাজা তাঁকে নিকটে ডাকলেন। প্রেমোন্মত্ততায় নিমজ্জিত অবস্থায় মোবারক কদমে সমর্পিত হলেন কুতুবুদ্দিন কাকী।

আদরের অন্তরালে অন্তরোচ্ছ্বাস চেপে রাখলেন প্রাণপনে। হজরত খাজা সান্ত্বনা দিলেন। বিদায়ের বেদনামাখা কণ্ঠে সুরা ফাতেহা শরীফ তেলাওয়াত করলেন। তারপর শোনালেন সান্ত্বনা বাণী, বৎস। চিন্তা করো না। মৃতের মতো আচরণ করো না।

প্রিয় মোর্শেদের নির্দেশানুযায়ী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী।

প্রিয় ফরজন্দের বিদায়ের পর দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজরত খাজা। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু এখন প্রতীক্ষিত দীদারে এলাহীর আনন্দে অধীর। সত্তার সীমানা জুড়ে এখন মাশুক মিলনের দ্যুতিদগ্ধ অনুরণন।

পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন মুরিদবৃন্দ, সবাই শোকাকুল। শোকাকুল আজমীরের আকাশ বাতাস। মহান প্রেমিক হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশ্তীর বিরহ যন্ত্রণায় বিষণ্ন প্রকৃতিতে শুধু 'বিদায়' শব্দেরই শত সহস্র উথাল পাথাল নিঃশব্দ উচ্চারণ।

৬ই রজব এশার নামাজ শেষে হজরত হুজরায় প্রবেশ করে অর্গলাবদ্ধ করলেন নিজেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশিষ্ট খাদেমবৃন্দ। সবাই বাইরে থেকে অনুভব করতে পারলেন, হজরত খাজা সারারাত ধরে এবাদতে মগ্ন হয়ে আছেন। কিন্তু শেষ রাতে আর সাড়া নেই। সব নীরব। নিথর।

পূব আকাশে ভোরের আলো উকি দিলো। সোবহে সাদেকের পবিত্র আভা ছড়িয়ে পড়লো আজমীরের পাহাড়ে পাহাড়ে। বৃক্ষরাজিতে।

আজান ধ্বনিত হলো মসজিদে। ঘোষিত হলো প্রেমিকজনের তৃষ্ণা নিবারণকারী জান্নাতী সঙ্গীত, সালাতের জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো। নিদ্রা নয় নিদ্রা নয়– দীদার।

কিন্তু এ উদাত্ত আহবানের আগেই পরম প্রভুর আহবানে সাড়া দিয়ে হজরত খাজা হাজির হয়েছেন চিরকালের চিরস্থায়ী আলয়ে। পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর প্রেমোন্মত্ত পবিত্র আত্মা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হজরত খাজার মহাপ্রস্থানের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। শোকের মাতম শুরু হলো সারা হিন্দুস্থানের প্রান্তরে প্রান্তরে।

সংবাদ পৌছলো দিল্লীতেও।

শোকাকুল কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী নামাজে বসলেন। একসময় শোকগ্রস্থ চোখ কখন যেনো তন্দ্রাভিভূত হয়েছে। দেখলেন হজরত কুতুবুদ্দিন, 'সামনে আল্লাহ্র আরশের বিশাল পরিধি। সেখানে দাঁড়িয়ে হজরত খাজা। তাঁর মোবারক কদম জড়িয়ে ধরে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তিনি।

প্রিয় মোর্শেদ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী র. বললেন, 'আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। ফেরেশতা সম্প্রদায় এবং আরশের প্রান্তরে বসবাসকারীদের মধ্যে আমাকে স্থান দিয়েছেন। আমি এখানেই অবস্থান করবো।'